তৃতীয় অধ্যায়

সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে বৈষ্ণবীয় ভাবনার রূপ প্রকৃতি

আধুনিক সাহিত্যের অন্যতম পথিকৃৎ, উপন্যাসের স্থপতি তথা বাংলা উপন্যাসের প্রাণপুরুষ রূপে প্রথমেই যাঁর নাম উঠে আসে তিনি আর কেউ নন স্বয়ং সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বে বাংলা 'উপন্যাস' রূপে অনবদ্য শিল্পকর্ম সে অর্থে উঠে আসেনি। মধ্যযুগীয় সাহিত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করলে প্রথমেই সংস্কৃত ভাষার আখ্যান-উপাখ্যানগুলির সতত বিস্তৃতি বা প্রভাব সক্রিয়ভাবে পরিলক্ষিত হয়। আর মধ্যযুগীয় বাতাবরণে সংস্কৃত ধর্মী সাহিত্য সৃষ্টি গুলিই বঙ্গ সাহিত্যের ভিত্তি প্রস্তর নির্মাণে বিশেষ সহায়ক ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রকৃত সূচনালগ্নে লেখকগণ সংস্কৃত ধর্মশাস্ত্র, পুরাণ ও প্রাচীন আখ্যায়িকাগুলির অনুবাদ বা ভাষান্তরে অধিক মনোনিবেশ করেছিলেন। এই অনুবাদ কর্মের উদ্দেশ্যই ছিল বঙ্গভাষা সাহিত্যের নবীনতম উপকরণগুলিকে নিজস্ব প্রকৃতি, পরিধি অনুযায়ী সঠিক অবয়বে প্রতিনির্মাণ করে এর কাব্য মহিমা, অতিরিক্ত আলংকারিক চাতুর্য, শব্দৈশ্বর্যে ভারাক্রান্ত বর্ণনাগুলির বাহুল্য অতিক্রম করে প্রকৃত সাহিত্য গুণান্বিত ও যথাসম্ভব বাস্তবতার সঙ্গে উপস্থাপন করা। এর তিনটি ধারাপথে প্রথমেই ছিল মঙ্গলকাব্য যার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল দৈবী প্রকোপ থেকে মুক্ত হয়ে মানবজীবনে সর্বমঙ্গলময় বার্তার আবহ রচনা করা। এরপর অনুবাদমূলক সাহিত্যকৃতি, যেখানে ভারতীয়ত্বের প্রতীক রূপে 'রামায়ণ', 'মহাভারত', 'ভাগবত' অনুবাদ কর্মের মধ্য দিয়ে প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য ও সামাজিক পরিস্থিতিকে মিলিত করার প্রচেষ্টা লক্ষিত হল। সেই সঙ্গে এতে যুক্ত হল আধুনিক বর্ণ যোজনা ও সাহিত্যরস, যেখানে পাঠকবর্গ বাঙালি প্রাণের অনুরণন ধ্বনি স্পষ্ট শুনতে পেলেন। কৃত্তিবাসী 'রামায়ণ' কাশীদাসী 'মহাভারত'-এর এই রূপ রূপান্তর একদিকে ভাবগতদিক থেকে গভীর পরিবর্তনের পাশাপাশি ভক্তিরস ও সুকুমার স্নেহে মানুষের বাস্তব জীবনকেই অভিব্যঞ্জিত করেছে। আর এর মধ্যে দিয়ে বঙ্গসাহিত্যও ক্রমপরিণতির দিকে আরো এক ধাপ অগ্রসর হয়েছে, এরপর বাঙলা সাহিত্যের সমৃদ্ধির পর্যায়ে 'বৈষ্ণবীয় সাহিত্য' পদচারণা করেছে ঠিকই কিন্তু রাধাকৃষ্ণের মহিমাজ্ঞাপক এই কাব্য সাহিত্যে ধর্মীয় পরিবেষ্টনের আধিক্য ছিল অতিরিক্ত। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের সামাজিক জীবনের নির্ভরযোগ্য বিবরণাত্মক পরিচয় পাওয়া সম্ভব হয়েছে চৈতন্যদেবের চরিত সম্পর্কীয় বিভিন্ন গ্রন্থ সমূহে। চৈতন্যজীবনীকে কেন্দ্র করে নানা অলৌকিকত্বকে প্রশ্রয় দেওয়া হলেও তৎকালীন সমাজের রীতি-নীতি, চাল-চলন, রুচি-আদর্শ, সাধারণ লোকের দৈনিক

জীবনযাত্রার পাশাপাশি ধর্মীয় প্রেক্ষাপট উঠে এসেছে। অর্থাৎ বিভিন্ন লৌকিক ও সামাজিক প্রতিচ্ছবি সে সময় থেকেই বাংলা সাহিত্যের সিংহদুয়ারে কড়া নাড়তে থাকে। বৈষ্ণব সাহিত্য থেকে উঠে এসেছে নর-নারীর প্রেমময় সুদূর আত্মদহন, মিলন, বিরহ, প্রতীক্ষার এক অভূতপূর্ব আর্তধ্বনি।

এভাবেই চলতে চলতে যুগের ক্রমবর্ধমান অগ্রসরতায় অষ্টাদশ শতকের শেষ লগ্ন থেকে একদিকে নবজাগরণিক চেতনা অন্যদিকে পাশ্চাত্যের শিক্ষা, সংস্কৃতি ক্রমশ বাঙালির চিন্তা চেতনায় প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা বাঙালির অন্তঃকরণে এক সুনিয়ন্ত্রিত, সংযত স্বরূপে আলোড়নের সৃষ্টি করে রাজা রামমোহনের সচেতন দৃষ্টিতে উঠে এল ইংরেজদের ব্যবসায়িক অর্থনীতিই একমাত্র পদবাচ্য নয়, সেই সঙ্গে তাদের শিক্ষা সংস্কৃতির আলোড়নের পথরেখা বাঙালির সাহিত্যিক আদর্শকে ভিন্ন মার্গে প্রবাহিত করতেও সক্ষম। বাস্তব জীবনের এমনই ঘন সন্ধিবদ্ধ ঘটনার ধারাবাহিকতা ও শিল্পী মনের সচেতন, সম্পূর্ণ, অন্তঃসংগতির বিশিষ্ট চেতনা থেকেই সৃষ্টি হল সাহিত্যের এক অভূতপূর্ব নবাঙ্কুরের, যার পরিব্যাপ্তি সমগ্র জীবনের আত্মজৈবনিক ইতিকথার সমার্থক, সেই শিল্প সৃষ্টির নামই হল উপন্যাস। এর প্রথম পরিচয় পাওয়া যায় ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে 'সমাচার দর্পণ'-এ 'বাবু' চরিত্র আলোচনায়। এর দু'বছর পর প্রকাশিত হল 'নব বাবুবিলাস' (১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দ), অনেকেই একে প্রথম উপন্যাসের মর্যাদা দিয়েছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বসূরী লেখকদের পাশ্চাত্য উপন্যাস অনুসরণের একটা প্রবণতা দেখা যায় ঠিকই, কিন্তু পরবর্তীকালে আধুনিক যুগজিজ্ঞাসা, জীবন সংকট-সমস্যা, মানব ইতিহাসের ভাগ্যবিড়ম্বিত-প্রবঞ্চিত নরনারীর অসহায় অন্তহীন বেদনাহত হৃদয়গুলি এক গভীর দার্শনিক প্রত্যয়ে প্রতিফলিত করার আত্ম-আকাঙ্ক্ষা ব্যাপক অর্থে উঠে আসার এক প্রবল সম্ভাবনা তৈরি হয়। এ প্রসঙ্গে প্যারিচাঁদ মিত্র ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুরের 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দ), অন্যদিকে কালিপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' (১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দ)-কে আমরা এক বাস্তব সামাজিক দলিল রূপে পরিগণিত করতে পারি। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে প্রবেশের পূর্বে এই দুটি গ্রন্থ সংক্ষেপে প্রাসঙ্গিক রূপে উপস্থাপনের প্রচেষ্টা করা হয়েছে। গ্রন্থ দুটিতেই সমকালীন তথা গ্রহণযোগ্য সামাজিক, পেশাগত মানুষ তথা কালের পদধ্বনি ঝংকৃত হয়েছে। কিন্তু তাঁরা জৈবনিক উপাদানগুলি বিশ্লেষণের অপেক্ষা ঘটনার আড়ম্বরে নিজেদের রচনাকে আবৃত রেখেছেন।

এই সময়ে কলকাতা সমাজের বিলাস, ব্যভিচার ও উপন্যাসের সূচনালগ্নের ক্রম বিবর্তমান সময়ে রচিত হল প্যারিচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দ)-এ মূলত সে সময়কার সামাজিক অবক্ষয়, যুব সমাজের চিন্তা চেতনাকে সেখানে তুলে ধরা হলেও রচনাটি উপন্যাস

সাহিত্যের যৌবন-কৈশোর লগ্নকে অতিক্রম করে এক ক্রমপরিণতির দিককে সূচনা করেছিল। এর ঠিক আট বছর পর অর্থাৎ ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দুর্গেশনন্দিনী'-র মধ্য দিয়েই উপন্যাসের মহিমান্বিত, প্রাণশক্তিতে বলীয়ান এক সার্থক অবয়বের জন্ম হল।

বঙ্কিমচন্দ্রের হস্ত স্পর্শেই 'দুর্গেশনন্দিনী'-র মধ্য দিয়ে সর্বপ্রথম উপন্যাসে এক নির্লিপ্ত অন্তর্দৃষ্টি ও আশ্চর্য মৌলিকত্ব প্রতিফলিত হয়েছে। এ প্রতিভা তাকে কালের ধনঞ্জয় রূপে সব্যসাচিত্ব কৃতিত্বে অভিষিক্ত করেছে। তিনিই সর্বপ্রথম মানব আবেগ, কৃত্রিমতাকে পরিহার করে তাকে যুক্তি বিচারের পরাকাষ্ঠায় প্রতিধ্বনিত করে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। আধুনিক ভারতীয় কথা সাহিত্যে তিনিই সর্বপ্রথম ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে বুদ্ধিদীপ্ত জীবন শিল্পী রূপে আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি তাঁর সাহিত্যে নানা বিপরীত, বিশৃঙ্খল, অবাঞ্ছিত মতামত ও পথ, ভাবাদর্শ, সংস্কার, প্রগতিশীলতা, রক্ষণশীলতার অনবদ্য সহাবস্থান করেছেন, কিন্তু কাউকে কখনো নিষ্প্রভ করে রাখেননি; জীবনের বহু উত্থান পতনে নিজস্ব চিন্তাভাবনা, যুক্তি বুদ্ধি ও জ্ঞানের আলোকে নিজেকে স্বতন্ত্র মর্যাদায় প্রজ্জ্বলিত রেখেছেন। তাঁর উপন্যাসে জীবনধর্ম ও মানস প্রবৃত্তিকে অন্তরস্থিত করার পর তিনি এক কল্যাণকামী সত্তার অনুসন্ধান করেছেন।

উনিশ শতকীয় রেনেসাঁসের এক সুগভীর প্রভাব সাহিত্যের দ্বিগ্বলয়ে প্রভাবিত করেছিল। নবজাগরণের মূল মন্ত্রই ছিল ভাবনার উৎকর্ষতাসাধন, সকল প্রতিবন্ধকতাকে সমাধিস্থ করে মানব মনের অসীম উদারতা দান। একদিকে নবজাগরণ, অন্যদিকে শাস্ত্রের কুটিল নাগপাশ অতিক্রম করে আত্মপ্রতিষ্ঠার দুর্জয় শক্তি সঞ্চয়, সেই সঙ্গে প্রেমের বলে বলীয়ান হয়ে আত্মশক্তির বীজমন্ত্রই বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের ভিত্তি প্রস্তর নির্মাণে বিশেষ ভাবে সহায়তা করেছে। মানব জীবনের উত্থান-পতনময় পথে প্রেমের অমৃত স্রোতধারা যেন তাকে সতেজ, সজীব ও সবুজময় করে তোলে। প্রেমের জন্যই একদিকে যেমন ঘর বাঁধা, আবার এই প্রেমের কারণেই অভিসারময় দীর্ঘ পথযাত্রা, গৃহত্যাগ। কখনো বা এর পরিণতি ঘটেছে অশ্রুর করুণ নির্ঝর তথা বেদনার অমোঘ দীর্ঘশ্বাসে। এই বেদনার অশ্রুপথই বঙ্কিমের সৃষ্টিকে বানিয়েছে তীক্ষ্ণ, সুন্দর, তাৎপর্যময় কখনো বা নিরূপায় ও অসহায়; আত্মবোধের চিরন্তন জিজ্ঞাসাতেই জীবন দর্শন ও ভাবাদর্শ কোথাও মিলে গেছে বৈষ্ণবীয় ভাবধারার সূক্ষ্ম, কোথাও বা বিস্তীর্ণ প্রভাবিত আলোকমার্গে। এই বৈষ্ণবতত্ত্ব দর্শনগত প্রভাব কোথায় কোন্ পটভূমিকায় কতটা প্রতিবিম্বিত হয়েছে, সেটাই আমাদের অনুসন্ধিৎসু বিষয়। বৈষ্ণব পদাবলীতে রাধিকার চিত্তদীর্ণ তীব্র আকুলতাকে পদকর্তারা যেভাবে কাব্যের প্রাণরূপে কল্পনা করেছেন, ঠিক সেই প্রকার ভাবানুভূতির অনুষঙ্গ, বৈষ্ণব তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটে আমরা

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসেও অনুসন্ধানে আগ্রহী হয়েছি। এই রূপ আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে বঙ্কিম উপন্যাসবিশ্বে আলোকপাত করলে উঠে আসে তাঁর বিরচিত বেশ কয়েকটি উপন্যাস। 'Indian Field' নামক একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় 'Rajmohan's Wife' (১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দ) ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম রচনা বা উপন্যাস হলেও 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দ)-র মধ্য দিয়েই বাংলা কথাসাহিত্যের সার্থক উপন্যাসের অভিষেক ঘটে। এরপর তিনি রচনা করেন 'কপালকুণ্ডলা' (১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দ), 'মৃণালিনী' (১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দ), 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দ), 'ইন্দিরা' (১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দ), 'যুগলাঙ্গুরীয়' (১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দ), 'চন্দ্রশেখর' (১৮৭৫খ্রীষ্টাব্দ), 'রজনী' (১৮৭৭খ্রীষ্টাব্দ), 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দ), 'রাজসিংহ' (১৮৮২খ্রীষ্টাব্দ), 'আনন্দমঠ' (১৮৮২খ্রীষ্টাব্দ), 'দেবী চৌধুরাণী' (১৮৮৪খ্রীষ্টাব্দ), 'রাধারাণী' (১৮৮৬খ্রীষ্টাব্দ), 'সীতারাম' (১৮৮৭খ্রীষ্টাব্দ)।

কথাসাহিত্যে প্রথম প্রভাতের সূর্যোদয়ের সূচনায়, বিশেষত, ঊনবিংশ শতাব্দীর এক বিশেষ মুহূর্তে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবধারার এক অভূতপূর্ব মেলবন্ধনকারী রূপে ১৮৬৫-র 'দুর্গেশনন্দিনী'র মধ্য দিয়ে আবির্ভূত হয়ে ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসের যে প্রেক্ষাপট রচনা করেছেন তা প্রকৃতপক্ষে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের প্রেক্ষাপট। একদিকে নবজাগরণের ব্যাপ্তময় পটভূমি, অন্যদিকে নাগরিক জীবনের প্রতি মানুষের ক্রমবর্ধমান আকর্ষণ। এর পাশাপাশি শিল্পায়নের ফলে শহরমুখী মানুষের আগমনে আধুনিক জীবনাদর্শ প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করে। ফলে ঊনবিংশ শতাব্দীর নানা সংস্কারমুখী আন্দোলন, কলকাতার মধ্যবিত্ত মানসকে কেন্দ্র করে ব্যক্তিসত্তার বহিঃপ্রকাশ, ব্যক্তিস্বাধীনতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, নারীত্বের মর্যাদাদান, তাদের আত্মমর্যাদাবোধের উন্মেষ বঙ্কিম উপন্যাসের অভিনব প্রাণস্পন্দন যুক্ত করেছে। এছাড়াও উনিশ শতকীয় সমাজ জীবনের ধর্মীয় সংস্কার মূলক আন্দোলন, হিন্দু ধর্মের রক্ষণশীলতা, ব্রাহ্মসমাজের নতুন মতাদর্শের উত্থান, সামন্ততন্ত্রীয় ভাবধারা এবং সংঘাত, উত্থান পতন প্রভৃতি বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলীতে বিশেষত, উপন্যাস শিল্পে আর্থ-সামাজিক পটভূমিকা নির্মাণ করেছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে বাঙালির পারিবারিক জীবনের স্পষ্ট প্রতিচ্ছবির মধ্যে নারীহৃদয়ের অন্তর্যন্ত্রণা প্রকাশের বহু প্রেক্ষাপটে আমরা রাধার চিত্তদীর্ণ তীব্র আকুলতাকে প্রকাশিত হতে দেখি। শৈবলিনী, কুন্দনন্দিনী, মৃণালিনী প্রভৃতি চরিত্রগুলিকে সামাজিক পটভূমিতে বঙ্কিমচন্দ্র আধুনিক দাবদাহে অঙ্কন করেছেন। রাধিকার হৃদয়ে কৃষ্ণবাসনার যে প্রবল আর্তি, বিরহ, মিলনাকাঙ্ক্ষা, অভিসারের দীর্ঘ ঘনঘটা, পূর্বরাগ, অনুরাগের মোহাবিষ্টতা বঙ্কিম উপন্যাসে 'বিষবৃক্ষ'-এর বৈষ্ণবী,

'মৃণালিনী'-র গিরিজায়া'-র মধ্যে অনেকাংশে প্রতিভাত হতে দেখি। যেখানে নারীরা প্রিয়মিলনের দাবদাহে, ব্যর্থতায় অন্তরের শক্তিকে সান্ত্বনা রূপে গ্রহণ করে জীবনের অন্তিম স্বস্তি পেতে চেয়েছে। আধুনিকযুগের সূচনা লগ্নে বঙ্কিম উপন্যাসের ব্যাপ্তময় পটভূমির বৈষ্ণবীয় অনুষঙ্গের ক্রমশ অভ্যন্তরে প্রবেশের পূর্বে এগুলিকে আমরা তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছি—

১. ইতিহাস ও রোমান্সধর্মী শ্রেণিতে বিদ্যমান— 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা', 'মৃণালিনী', 'যুগলাঙ্গুরীয়', 'চন্দ্রশেখর', 'রাজসিংহ', 'সীতারাম'।

২. পারিবারিক ও সমাজতত্ত্বমূলক শ্রেণিতে রয়েছে— 'বিষবৃক্ষ', 'ইন্দিরা', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'রজনী', 'রাধারাণী'।

৩. দেশাত্মবোধকের শ্রেণিতে পড়েছে— 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরাণী'।

দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দ):

'দুর্গেশনন্দিনী' ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে মার্চ মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। বাংলা ভাষায় রচিত সর্বপ্রথম সার্থক ইতিহাসমিশ্রিত রোমান্সধর্মী উপন্যাস। উপন্যাসটি বঙ্কিমচন্দ্র উৎসর্গ করেছিলেন শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়কে। মোগল পাঠান ইতিহাসের পটভূমিকায় রচিত উপন্যাসের মুখ্যচরিত্র হিসেবে উঠে আসে বীরেন্দ্রসিংহ, জগৎসিংহ, তিলোত্তমা, আয়েষা, বিমলা এবং ওসমান খাঁ। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালে উক্ত উপন্যাসটির তেরোটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এর সর্বশেষ সংস্করণটি প্রকাশিত হয় ১৮৯৩ সালে। ইতিহাসের এক অভিনব নাট্যিক আঙ্গিক পরিবেশন করে অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তিনি; যেখানে আমরা ইতিহাস ও উপন্যাসকে এক সূত্রে গ্রথিত করতে পেরেছি। ৯৯৭ বঙ্গাব্দের নিদাঘ রজনী অতিক্রম করে ঔপন্যাসিক এক অশ্বারোহী পুরুষকে বিষ্ণুপুর থেকে মান্দারণের পথে একাকী গমন করিয়ে এক অভূতপূর্ব বিস্ময়মার্গ রচনা করেছেন। যেখানে বহু চরিত্রের বহু পদসঞ্চরণে আমরা অতীত স্মৃতি চারণার বহুব্যাপ্তি পরিলক্ষিত করতে পারি। বৈষ্ণব ভাবধারার বিচ্ছুরণ কতটা পরিলক্ষিত তা পর্যায়ক্রমিক আলোচনায় উপস্থাপিত হবে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকে লেখা 'দুর্গেশনন্দিনী'-তে আকবরী শাসন অর্থাৎ মোঘল শাসনাধীনে বাংলার মোঘল পাঠানের লড়াইকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। ইতিহাসাশ্রয়ী কাহিনীতে বিমলার পরিণতি এবং জগৎসিংহ তিলোত্তমা-আয়েষার কাহিনীই এর মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। নারীর আন্তরিক বাসনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ, স্নেহ-প্রেম-প্রীতি-অনুরাগ-অভিমানকে নানা বিশ্লেষণী পটভূমিকায় দণ্ডায়মান করলেও শ্রীরাধিকার প্রতিচ্ছবি প্রচ্ছন্ন আভাসে প্রজ্জ্বলিত হতে দেখি। এই প্রজ্জ্বলনের স্পষ্ট দর্শন প্রতিকায়িত হতে দেখি এই উপন্যাসের চরিত্র আয়েষার মধ্য

দিয়ে। কিন্তু 'দুর্গেশনন্দিনী'-র মধ্যদিয়ে যুগ বিবর্তনের যে ইঙ্গিত স্পষ্ট হয় তার বিশ্লেষণ ও বৈষ্ণবীয় তত্ত্বগত প্রেক্ষাপট বর্তমানে আমাদের অন্বিষ্ট বিষয়। উপন্যাসের কাহিনী শুরু হয়েছে জগৎসিংহ বিষ্ণুপুর থেকে মান্দারণ চলেছেন, পথে ঝড়ের প্রতাপে শৈলেশ্বর মহাদেব মন্দিরে আশ্রয় নেওয়ার সময়, ঐ মন্দিরে পূজা করতে গিয়ে আটকে পড়েন দূর্গঅধিপতি বীরেন্দ্র সিংহের স্ত্রী বিমলা ও কন্যা তিলোত্তমা। তাদের একে অপরের সঙ্গে পরিচয়ের মধ্য দিয়েই জগৎ সিংহ ও তিলোত্তমা প্রেমাবিষ্ট হয়ে পড়েন। এরপর বিমলা ঘটনাক্রমে জগৎসিংহকে তিলোত্তমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে নিয়ে যাবার সময় পাঠান নবাব কতলু খাঁর সেনাপতি ওসমান গুপ্তচর পাঠিয়ে বীরেন্দ্র সিংহের দূর্গে প্রবেশ করে বীরেন্দ্রসিংহ, জগৎসিংহ, বিমলা, তিলোত্তমাকে বন্দী করেন। জগৎসিংহ আহত হলে ওসমান ও আয়েষা তার অভূতপূর্ব সেবা করেন। বন্দী জগৎসিংহকে সেবার মধ্য দিয়েই আয়েষা তার প্রেমে মোহাবিষ্ট হন। কিন্তু জগৎসিংহ তার সেবায় সন্তুষ্ট হলেও তাকে প্রেমময় দৃষ্টিতে কখনোই দেখেননি। অন্যদিকে ওসমান আয়েষাকে ভালোবাসতেন। কিন্তু ওসমানের প্রতি আয়েষার সে মনোভাব কখনোই ছিল না। আয়েষা জগৎসিংহকে বন্দী অবস্থা থেকে পরিত্রাণের প্রচেষ্টা করলেও প্রতিশোধে বিমলা একদিন কতলু খাঁকে হত্যা করেন। বিমলা তিলোত্তমাকে কৌশলে মুক্তি করান। অন্যদিকে জগৎসিংহ মুক্তি পেয়ে পাঠানদের সঙ্গে সন্ধি করেন। জগৎসিংহর সান্নিধ্যে ক্রমে তিলোত্তমা সুস্থ হয়ে তার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। আয়েষার অতৃপ্ত প্রেম আত্মহননের মধ্য দিয়ে পরিসমাপ্ত হতে গিয়েও প্রবল জীবনাবেগে বেঁচে থাকে। ওসমান, জগৎসিংহের দ্বন্দ্বে ওসমান ক্রমে পরাজিত হন। এছাড়াও কয়েকটি বিক্ষিপ্ত ঘটনার মধ্য দিয়ে কাহিনীকে সুসংবদ্ধ স্বরূপে নির্মাণ করে বঙ্কিমচন্দ্র একটি মিলনাত্মক পরিণতি দেখিয়েছেন বাংলার প্রথম সার্থক উপন্যাসটিতে। আয়েষা, তিলোত্তমার হৃদয়ে জাগ্রত প্রেমের নানা কৌণিক প্রেক্ষাপটকে খুব বেশি বৈষ্ণব সাহিত্যের সঙ্গে একীভূত করা না গেলেও সনাতনী নারী অন্তর্দাহে কোথাও যেন রাধার সঙ্গে আয়েষা, তিলোত্তমা ঘন সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যাকাশে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'দুর্গেশনন্দিনী'-র মত উপন্যাস অধ্যয়নে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে মননশীল সাহিত্য রচনার মধ্য দিয়ে জীবনের এক নবমূল্যায়ন ও মানব সম্পর্কের নানা সমীকরণকে বৈষ্ণবীয় তত্ত্বের নিরিখে সজ্ঞায়িত করেছেন। প্রাচীন দূর্গ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, চারিত্রিক গাম্ভীর্য তাঁর উপন্যাসের পটভূমিকে সুনির্দিষ্ট অভিমুখে এগিয়ে নিয়ে গেছে। উপন্যাসটিতে রোমান্স, ঐতিহাসিক যুদ্ধ-বিগ্রহের পাশাপাশি প্রেমের এক পরকীয়া তত্ত্বানুষঙ্গের প্রসঙ্গকে নির্দ্বিধায় উন্মুক্ত করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। জগৎসিংহের প্রতি তিলোত্তমার চিত্ত

চাঞ্চল্যে স্পষ্টতই উপন্যাসে কবি জয়দেবের 'গীতগোবিন্দম্' গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়। গ্রন্থটি পাঠ করে নায়িকা তিলোত্তমার জগৎসিংহের প্রতি শ্রীরাধার কৃষ্ণ দর্শনের অপেক্ষমান মানবীয় অনুভূতির অনুরূপ ভাবনার উদয় হয়, যা কিনা পদসাহিত্যে শ্রীরাধার আক্ষেপানুরাগের প্রসঙ্গকে অনুরূপভাবে প্রতিবিম্বিত করে। প্রকৃতপক্ষে শ্রীরাধার আক্ষেপানুরাগ, অনুরাগেরই নামান্তর মাত্র। পূর্বরাগ থেকে মাথুর পর্যন্ত শ্রীরাধার আত্মানুভূতিতে আক্ষেপের সুর যেভাবে সংযোজিত হয়েছে, তিলোত্তমার হৃদয়াকাশেও জগৎসিংহের অদর্শনে সেই একই আক্ষেপের সুর গুঞ্জরিত হয়ে চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত হয়েছে। এখানে তিলোত্তমা কুলবতী নারী হয়েও মানসধর্মে পদাবলীর নায়িকা রাধার সমগোত্রীয় হয়েছেন। একথা স্বাভাবিক ভাবেই অনুধাবন করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র তিলোত্তমা প্রসঙ্গে বলেছেন—

''... গীতগোবিন্দ পড়িতে লাগিলেন; গীতগোবিন্দ কিছুক্ষণ ভালোলাগিল, পড়িতে পড়িতে সলজ্জ ঈষৎ হাসিয়া পুস্তক নিক্ষেপ করিলেন। পরে নিষ্কম্পা হইয়া শয্যার উপর বসিয়া রহিলেন। ....''[১]

ঔপন্যাসিক উপন্যাসে স্পষ্ট দেখিয়েছেন কিভাবে নায়িকা তিলোত্তমা রাধাকৃষ্ণ কেন্দ্রিক উপাখ্যান 'গীতগোবিন্দম্' পঠনরত কালে রাধাকৃষ্ণ কেন্দ্রিক ভাবনায় ভাবিত হয়ে জগৎসিংহের প্রতি প্রেমে বিহ্বল হয়ে পড়েন। প্রকৃতপক্ষে, 'গীতগোবিন্দম্' জয়দেবের বিশুদ্ধ কৃষ্ণলীলা সন্দর্ভ বিশেষ। জয়দেব শুধুমাত্র হরিস্মরণ বিলাসে কলা কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য কাব্যটি রচনা করলেও নায়িকা রাধার পরকীয়া প্রেমের শ্রেষ্ঠত্বে শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া নায়িকা রুক্মিণী, সত্যভামা অপেক্ষা কয়েকগুণ অধিক প্রকাশিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো রূপ গোস্বামীর সংকলিত 'বৈষ্ণব পদ্যাবলী'-র ৩৭২ সংখ্যক শ্লোকেও দ্বারকাধিপতি কৃষ্ণের প্রতি রাধাপ্রেমের মাধুর্যই অনেকাংশে প্রকাশিত। এমনকি 'সদুক্তিকর্ণামৃত' -এ উদ্ধৃত কৃষ্ণশ্রুতিতে গর্বিত রাধার প্রেমমহিমা কৃষ্ণের প্রতীক্ষায় যে শঙ্কা-অনুনয়-বিনয়ের মিশ্রিত দৃষ্টির মহিমা বহুল গুরুত্ব পেয়েছিল; ঠিক সেই অনুরূপ অনুভূতি জগৎসিংহের প্রতীক্ষায় তিলোত্তমার মত নারীর অনুভূতি একই সমতুল্যতা পেয়েছে। রাধাকৃষ্ণের সর্বোত্তম প্রেমমহিমার জয় ঘোষণার মতই জগৎসিংহ তিলোত্তমার প্রেম জীবনের প্রেক্ষাপট বঙ্কিমচন্দ্র ইঙ্গিতে 'গীতগোবিন্দম্'-এর মত কাব্য প্রসঙ্গের মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন। এ প্রসঙ্গে উপন্যাসে বিমলার কথায় স্পষ্ট ফুটে উঠেছে—

১. ''আমি আজ চৌদ্দদিন অহোরাত্র তিলোত্তমার ভাবগতিক বিলক্ষণ করিয়া দেখিতেছি, আমার মনে এমন বোধ হইয়াছে যে, তিলোত্তমার মনোমধ্যে অতি প্রগাঢ় অনুরাগের সঞ্চার

হইয়াছে।”[২]

২. ‘‘... পক্ষমধ্যে তিলোত্তমার স্বভাব পরিবর্তন হইয়াছে! তিলোত্তমা আর প্রায় কথা কয়না; তিলোত্তমার পুস্তকসকল পালঙ্কের নীচে পড়িয়া পচিতেছে। তিলোত্তমার ফুল গাছ সকল জলাভাবে শুষ্ক হইল; তিলোত্তমার পাখিগুলিতে আর সে যত্ন নাই; ... নিজে আহার করে না; বা রাত্রে নিদ্রা যায় না; ... বেশভূষা করে না;... কখনো চিন্তা করে না, এক্ষণে দিবানিশি অন্যমনে থাকে। তিলোত্তমার মুখে কালিমা পড়িয়াছে।”[৩]

তিলোত্তমার এই ভাব দৈহিক বিচ্ছেদ যন্ত্রণার উর্দ্ধে মানসিক আবেগজনিত চিত্তমন্থন, আলোড়ন শ্রীরাধার চিত্ত আলোড়নের সমগোত্রীয়। অপার্থিব প্রেমকে পার্থিব রূপ দিতে জয়দেব যেমন সকল তত্ত্ব দর্শনের ঊর্দ্ধে মানবিক অনুভূতিকেই গুরুত্ব দিয়েছেন, তাঁর আত্মগত ভাবনার আলোকে রূপ ও রসে প্রাকৃত অপ্রাকৃত প্রেমের যুগলমূর্তি রচনা করেছিলেন। আলোচ্য উপন্যাসে নায়িকার মনে নায়কের প্রতি চিত্তচাঞ্চল্যও সেই একই জয়দেব কথিত বৈষ্ণবভাবনার অনুরূপ। তিনিই প্রাচীন যুগে দাঁড়িয়ে যেভাবে নায়িকা রাধার প্রেমকে অখণ্ড তথা বলিষ্ঠ আবেদনে উন্মুক্ত করেছেন, ঠিক সেভাবেই বঙ্কিমচন্দ্র উনিশ শতকে দাঁড়িয়ে নায়িকার চিত্তচাঞ্চল্যকে পূর্ণ মর্যাদা দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। জয়দেব যেমন ক্ষণবিরহের এক অপার পরিমণ্ডলে মিলনাত্মক পরিণতিকে সূচিত করেছেন। ঠিক সেভাবেই তিলোত্তমার প্রেমেও ক্রমপরিণতি ও মিলনের প্রতি উপন্যাসের জীবনাকাঙ্ক্ষার আর্তি স্বাভাবিক গতিপথেই অগ্রসর হয়েছে।

তিলোত্তমা, জগৎসিংহের পর বিমলা ও দিগগ্জ ঠাকুরের সঙ্গে একটি রসিকতার ক্ষেত্রে বৈষ্ণবীয় আদর্শ প্রচ্ছন্নে উঠে এসেছে, দিগগ্জ ঠাকুর আলোচ্য উপন্যাসে এক ব্রাহ্মণ। তিনি পণ্ডিত মানুষ, বিমলা তাঁকে একটি গীত উপস্থাপন করতে বললে তিনি গেয়ে ওঠেন—

‘‘... সই, কি ক্ষণে দেখিলাম শ্যামে কদম্বেরি ডালে।
সেই দিন পুড়িল কপাল মোর—
কালি দিলাম কুলে।।
মাথা চূড়া হাতে বাঁশী কথা কয় হাসি হাসি
বলে ও গোয়ালা মাসী— কলসি দিব ফেলে।”[৪]

এ গীত এক অর্থে শ্রীকৃষ্ণের বাল্য চাতুর্যকেই স্মরণ করায়। স্বল্প পরিসরে হলেও এ অনুষঙ্গ উপন্যাসের নিরিখে একটি স্নিগ্ধ আবহকে নির্মাণ করে পাঠককে বৈষ্ণবীয় অনুষঙ্গকে স্মরণ করিয়েছে।

তাই ‘দুর্গেশনন্দিনী’ উপন্যাসে জগৎ সিংহ, তিলোত্তমা, আয়েষা, বিমলা, ওসমানের মত

চরিত্রগুলি প্রেমের নানা কৌণিক প্রেক্ষাপটে উঠে এসে একদিকে যেমন ইতিহাসকে গতি দেখিয়েছেন, তেমনি অন্যদিকে প্রেমের আশ্রয়ে চরিত্রের অন্তরাত্মাকে আন্দোলিত করেছে। তবে সব মিলিয়ে উপন্যাসে সে অর্থে চারিত্রিক বা কাহিনীগত পরিপূর্ণতা সফল ভাবে ফুটে ওঠেনি। স্ত্রী চরিত্রের অনুভূতিকে শুধুমাত্র শব্দের বাহুল্যে জর্জরিত করেছেন, তিলোত্তমার হৃদয়ে জগৎসিংহের প্রতি আনুগত্যে বা জগৎসিংহের প্রতি আয়েষার অনুরাগ প্রকাশের ভঙ্গিমায় সংলাপের স্বল্পতা, শব্দের গাম্ভীর্য বা গভীরতা সে অর্থে প্রগাঢ়তা দেখাতে পারেনি। তিলোত্তমার বালিকা সুলভ বিহ্বলতার কাছে শৈলেশ্বর মন্দিরে বিমলা ও জগৎসিংহের কথোপকথনে অনেক বেশি পরিপক্কতা ও বাস্তবতার চিত্র আভাসিত হয়েছে।

বৈষ্ণবীয় প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণে খুব স্বল্প পরিসর উঠে আসার কাহিনীবৃত্ত, যে যুগে দাঁড়িয়ে নরনারীর চিত্তবিহ্বলতার সামঞ্জস্য ও পরকীয়া ভাবধারা পরিব্যাপ্ত হলেও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পরবর্তী বহু উপন্যাসে বৈষ্ণব ভাবনা ও তত্ত্বগত দিক উঠে এসেছে। শিল্পীর মানসোৎকর্ষের ক্রমবিকাশ এভাবেই বাংলা কথাসাহিত্যে পরবর্তী লেখকদের কাছে প্রতিবিম্বিত রূপে উদ্ভাসিত হয়েছে।

ঐতিহাসিক উপন্যাস তথ্য সন্নিবিষ্ট হলেও মোগল পাঠান যুদ্ধের প্রেক্ষাপট অত্যন্ত ক্ষীণ মাত্রায় প্রতিভাসিত হয়েছে। ঐতিহাসিক পুরুষ চরিত্র যেমন— মানসিংহ, কতলু খাঁ প্রমুখরা ব্যক্তিমানুষ রূপে সে অর্থে স্বতন্ত্রতা দেখাতে পারেনি। কারণ ঐতিহাসিক প্রতিবেশ রচনা করা বঙ্কিমচন্দ্রের মুখ্য আলোচ্য বিষয় ছিল না। সেই তুলনায় ব্যক্তিচরিত্রের অন্তর্যন্ত্রণা ও তার উত্থানপতনের দাবদাহ, ভাগ্য পরিবর্তন উপন্যাসের ঘূর্ণাবর্তে বারবার আবর্তিত হয়েছে।

আয়েষার কারাগারে যে অভিনব বহিঃপ্রকাশ তা পাঠককুলকে চমৎকৃত করেছে। তিলোত্তমা, বিমলা ও আয়েষার রূপ ও প্রকৃতি বঙ্কিম অসামান্য নৈপুণ্যের সঙ্গে বিচার করেছেন। তিলোত্তমা, আয়েষা উপন্যাসের বহুক্ষেত্রে প্রায়ই নীরব ও স্বল্প কথায় নিজের বক্তব্যকে তুলে ধরেছেন ঠিকই কিন্তু ঔপন্যাসিকের ঔদার্যে তা অনেক গূঢ় প্রেমের প্রেক্ষাপট নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছে। তিলোত্তমার বালিকা সুলভ আচরণ, ব্রীড়াবনত প্রেম-বিহ্বলতা শ্রীরাধার প্রথম যৌবনের চাপল্যকেই মনে করায়। অন্যদিকে আয়েষার মহান গাম্ভীর্য ও গভীর আত্মসংযম— এমন এক স্বতন্ত্র স্বরূপ রক্ষা করেছে, যা নিঃন্দেহে উপন্যাসের প্রেমময় প্রেক্ষাপটকে বহুলাংশে আকর্ষণীয় করেছে। আয়েষার প্রেমে যে পরিণত নারীর আর্তি পাওয়া গেছে অনেক ক্ষেত্রে চণ্ডীদাসের রাধাকে স্নিগ্ধ প্রবাহে স্মরণ করায়। মূল প্রতিপাদ্য বিষয় বৈষ্ণবীয় প্রেম তত্ত্বানুষঙ্গের পথ অতিক্রম করেই তিলোত্তমা,

জগৎসিংহ, আয়েষার এই ত্রিকৌণিক সম্পর্ক মর্ত্যপৃথিবীর শাশ্বত আত্মত্যাগের বিরহ-মিলন-বিচ্ছেদ-আত্মগ্লানির এক অসামান্য পটভূমিকা রচনা করেছে, এ কথা অনুধাবন করা যায়।

কপালকুণ্ডলা (১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দ) :

'কপালকুণ্ডলা'- উপন্যাসটি রচিত হয় ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে। বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বিতীয় তথা ইতিহাসমিশ্রিত রোমান্স ধর্মী কাব্যিক উপন্যাস 'কপালকুণ্ডলা'। উপন্যাসটি উৎসর্গ করা হয় লেখক সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে। মেদেনীপুর জেলার নেগুঁয়া মহকুমায় অবস্থান কালে অর্জিত কিছু অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই উপন্যাস রচনা করেন বঙ্কিমচন্দ্র। মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলের শেষ অংশের পটভূমিতে রচিত উপন্যাস হিসেবে 'কপালকুণ্ডলা' বহু সমাদৃত। এই উপন্যাসের উল্লেখযোগ্য চরিত্র কপালকুণ্ডলা, নবকুমার, মতিবিবি, পদ্মাবতী।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচনাধর্মী মননশীল সাহিত্য রচনায় বহুল সমাদৃত হয়েছেন। একদিকে মননশীলবোধ, তন্মধ্যে সুষ্ঠু সুষমাময় বিন্যাস এক শিল্পশ্রীর পরিমণ্ডলকে উন্মুক্ত প্রেক্ষাপটে তাঁর মত ঔপন্যাসিক প্রতিভাকে স্বীকৃতি দিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। বিষয়গত দিকের দুঃসাহসিক পরিকাঠামো নির্মাণ, চরিত্রের উন্মুক্ত ও বহুব্যাপক বিশ্লেষণ তাঁর রচিত অন্যান্য উপন্যাস থেকে এই ঔপন্যাসটির ব্যতিক্রমধর্মিতাকে সুনিশ্চিত করে। এই উপন্যাস প্রসঙ্গে কথাসাহিত্য সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর' গ্রন্থে স্পষ্ট বলেছেন— সর্বপ্রথম 'কপাল কুণ্ডলা'-য় যে বিষয়টি পাঠককে চুম্বকের মত আকর্ষণ করেছে তা হল এর 'Strangeness'; এই বিস্ময়বোধ শুধুমাত্র ভৌগোলিক নয়, এই বিস্ময় চরিত্রসৃজনে, কাহিনীর ঘনঘটায় সর্বত্র বিদ্যমান। উপন্যাসের বহুক্ষেত্রে কাব্যময় রোমান্টিক আখ্যান, বিশেষত বিদ্যাপতির পদের অবতারণা উপন্যাসের রন্ধ্রে অভিনব রস সঞ্চার করেছে। প্রকৃতিতেই মানবমুক্তির সুর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে শ্রুত হয়েছে। 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে সম্পর্কের সেতু বন্ধনে তিনি পথিকৃৎ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে পাশ্চাত্য কথাসাহিত্যিকদের প্রভাবে, ইতিহাস প্রীতি ও চিত্রধর্মিতার সমন্বয়ে বহুকাব্যিক উক্তির অবতারণায় যা নির্মাণ করলেন তা নিঃসন্দেহে বৈষ্ণবীয় চিন্তার আলোকে বিশ্লেষণের দাবি রাখে।

'কপালকুণ্ডলা'-র কাহিনী নির্মাণ কৌশল, ভাবগত ঐক্য, কাব্যধর্মে, নাটকীয় গুণে, রোমান্সের নবত্বে, প্রকৃতি চিন্তা প্রভৃতি বিষয় সংস্থাপনে, প্রতিভার আনন্দ স্ফূর্তি উদগমে উপন্যাসটিতে লেখক অভাবনীয় সৌন্দর্য প্রদান করেছেন। উপন্যাসের বহু ছত্রে পাশ্চাত্যের ছায়াপাত ঘটেছে, বিশেষত ভাবগত সাদৃশ্যে শেকস্‌পিয়র, বায়রণ, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, কীটসের রচনাংশের বহু ছত্র উদ্ধৃত হয়েছে। বিশেষত, আভ্যন্তরীণ বিষয় নির্মাণের ক্ষেত্রে বঙ্কিমের পাশ্চাত্য অনুসরণ

বারম্বার প্রতিধ্বনিত হতে শুনি। কাহিনী সংক্ষেপে আলোচনা করলে প্রথমেই উঠে আসে কপালকুণ্ডলার সঙ্গে নবকুমারের পরিচয় হওয়া এবং অধিকারীর সহায়তায় তাদের বিবাহ সম্পাদন হওয়া, দ্বিতীয় অংশে উঠে আসে মতিবিবির আগমন ও তার কর্মসূচী এবং তৃতীয় অংশে মতিবিবি ও কাপালিকের ষড়যন্ত্রের প্রভাবে কপালকুণ্ডলা এবং নবকুমারের মৃত্যুদৃশ্য।

উপন্যাসের কাহিনী শুরু হয় মুঘল আমলে অর্থাৎ সপ্তদশ শতকের গোড়ার দিকে। তার কিছু প্রতিচ্ছবি কাহিনীতে ছায়াপাত করেছে। কিন্তু ইতিহাসের কাহিনী শুধুমাত্র উপন্যাসকে গতি দিতে ব্যবহৃত হয়েছে; মেহেরউন্নিসা মতিবিবির কাহিনীর কোন ঐতিহাসিক সংযোগ এখানে প্রায় নেই বললেই চলে। তাই ঔপন্যাসিকের জীবন জিজ্ঞাসা, রোমান্স, কাব্যধর্মিতায়, দার্শনিকতায় সাহিত্য সৃষ্টিরূপে উপন্যাসটি বাংলা কথাসাহিত্যের এক নতুন দিক নির্দেশ করেছিল একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। তিনি উপন্যাসে ইতিহাস ও প্রেমকে পশ্চাতে রেখে মানবীয় সম্পর্কের উৎসমুখকে এমনভাবে আবিষ্কার করেছেন, যাতে বাস্তব জীবনের প্রতিচ্ছবিটি স্পষ্ট দর্পণে উঠে আসে।

উপন্যাসের কাহিনীর সূত্রপাতে প্রথমেই দেখা যায় প্রায় দুই শত পঞ্চাশ বছর পূর্বের মাঘ মাসের রাত্রিশেষে এক যাত্রীবাহী নৌকার সাগরসঙ্গম থেকে প্রত্যাগমনের কাহিনী। ঘটনাক্রমে নায়ক নবকুমার সেই নৌকার এক যাত্রী হিসেবে আরোহন করে ও গন্তব্যে পৌঁছানোর পূর্বেই নৌকার সহযাত্রীরা তাকে পরিত্যাগ করে, ফলে জীবন সংগ্রামের অস্তিত্ব রক্ষার তার জীবন ও উপন্যাসের ঘটনা এরপর থেকেই গতিময়তা লাভ করে। আর এক অরণ্যপথে নবকুমারের সঙ্গে নায়িকা কপালকুণ্ডলার পরিচয় হয় এবং এর থেকে শুরু হয় নবকুমার ও কপালকুণ্ডলাকে নিয়ে উপন্যাসের কাহিনী ও তাদের জীবনের অগ্রযাত্রা। এখান থেকেই উপন্যাসে কপালকুণ্ডলার সহজ, সরল জীবনে এক অসাধারণ প্রতিবেশ রচনা হয়েছিল, তা তান্দ্রিকতার ভীষণতাও তার বাস্তবজীবনকে সুসংহত ও সামঞ্জস্য করেছিল। কারণ কপালকুণ্ডলা নবকুমারের সঙ্গে পরিচিত হবার পূর্বে কাপালিকের সান্নিধ্যে ছিল। তবে জীবনের বহু চড়াই-উৎরাই অতিক্রম করে সুকোমল মাধুর্যে, অন্তরের অদম্য স্বাধীনতা, দৃপ্ত ব্যক্তিত্ব, সংযম সাধনে, রমণীর কোমলতায়, শিক্ষায় এক চিরন্তনী স্ত্রী রূপে মার্জিত বঙ্গসাহিত্যের কাহিনীকে অনন্যতা দিয়ে নিজেকে ব্যতিক্রমী বানিয়েছেন।

আকবরী শাসনের শেষ সময়ে পর্তুগীজ ও অন্যান্য নাবিক দস্যুদের ভয়ে যাত্রীবাহী নৌকা দলবদ্ধভাবে ফিরছিল ও সপ্তগ্রামবাসী নবকুমার গঙ্গাসাগরে তীর্থ করে ফিরে আসার সময় ঘটনাচক্রে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এরপর নবকুমারের কাপালিক সংস্পর্শ, আত্মরক্ষার তাগিদে কপালকুণ্ডলার

সঙ্গে অধিকারীর আশ্রয়ী হওয়া ও শেষে উভয়ের বিবাহের মধ্য দিয়েই উপন্যাসের প্রথম অংশ সমাপ্ত হয়। এই অংশে আমরা বৈষ্ণব ভাবনার প্রত্যক্ষ ছায়াপাত বা অনুষঙ্গ কোনটাই খুঁজে পাইনি।

দ্বিতীয় অংশে নবকুমার ও কপালকুণ্ডলা সপ্তগ্রামের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে পথে পিছিয়ে পড়েন এবং ঘটনাচক্রে তার প্রথমা স্ত্রী রামগোবিন্দ ঘোষালের কন্যা পদ্মাবতীর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। কিছু দস্যু এই সময় পদ্মাবতীকে লাঞ্ছিত করছিল। নবকুমার তাকে উদ্ধার করে নিকটবর্তী এক পান্থশালায় উপস্থিত হন। কৈশোরে এই পদ্মাবতীই ছিল নবকুমারের স্ত্রী। মোগল পাঠান যুদ্ধে পদ্মাবতীর পরিবার প্রাণ রক্ষার্থে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করায় নবকুমারের পিতা সেই পুত্রবধূকে ত্যাগ করেন। বর্তমানে পদ্মাবতী জাতি, কুল, শীল বিসর্জন দিয়ে অভিজাত আমীর অমরাহদের বিলাস সঙ্গিনী রূপে জীবন অতিবাহিত করছে। অতীতে সে মতিবিবি নামে উড়িষ্যায় গমন করে। সেখান থেকে ফেরার পথেই নবকুমারের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ঘটে। বিচক্ষণ মতিবিবি নবকুমারকে চিনতে পারলেও নবকুমার মতিবিবি ওরফে পদ্মাবতীকে চিনতে অসমর্থ হন, কপালকুণ্ডলার অসামান্য সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে মতিবিবি তাকে বহুমূল্যবান অলংঙ্কারাদি প্রদান করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেননি। এদিকে সংসারের প্রভূত সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের পরও নবকুমার সমুদ্রের নির্জন তীরকে কোনভাবেই বিস্মৃত হতে পারছিলেন না। অন্যদিকে লুৎফ-উন্নিসা ওরফে মতিবিবি ওরফে পদ্মাবতী যুবরাজ সেলিমের গোপন প্রণয় সঙ্গিনী রূপে ভারত সম্রাজ্ঞী হবার গোপন আকাঙ্ক্ষাকে মনে মনে পোষণ করত। অন্যদিকে শের আফগানের মেহেরুন্নেসার প্রতি আসক্তি থাকায় সেলিমের পুত্রকে সিংহাসনে বসানোর ষড়যন্ত্র করলেও তা পরিণতি পায়নি। শেষে দিল্লির সকল সুখ ত্যাগ করে মতিবিবি ওরফে পদ্মাবতী সপ্তগ্রামে নবকুমারের সুখী দাম্পত্যের অংশীদার হতে সেখানে গমন করেন। আগ্রার বিলাসবহুল জীবন পরিত্যাগ করে সে নবকুমারকে আপন পরিচয় জ্ঞাপন করে তার প্রেমাস্পদের অধিকারী হতে চাইলে নবকুমার তাকে প্রত্যাখ্যান করেন।

এরপর পরবর্তী পর্যায়ে কপালকুণ্ডলাকে কাপালিকের দীর্ঘ এক বৎসরের অনুসন্ধানের পর সপ্তগ্রামে আগমন ও ছদ্মবেশী পদ্মাবতীর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে নবকুমার ও কপালকুণ্ডলার মধ্যে নানা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করা, তাদের মৃত্যুর দিকে নিয়ে যাওয়া, দুটি নিষ্পাপ ও সুকোমল জীবনের মর্মান্তিক পরিসমাপ্তি ঘটানো, এর মধ্য দিয়েই উপন্যাসের কাহিনী সমাপ্ত হয়েছে। এই সংক্ষিপ্ত কাহিনীর মধ্যে বৈষ্ণবীয় অনুষঙ্গ তৃতীয় খণ্ডের 'পঞ্চম পরিচ্ছেদ: আত্মমন্দিরে' অংশটিতে লক্ষিত হয়েছে। লুৎফ -উন্নিসা যখন সেলিমকে পাওয়ার সকল পথ থেকে বঞ্চিত হলেন, এমনকি সেই অনুভূতি যখন তার অন্তরাত্মায় সুদৃঢ় ভাবে প্রোথিত হল তখন তিনি সকল রাজসুখ ঐশ্বর্য,

ভোগবিলাস পরিত্যাগ করতে চাইলেন। কারণ নারী হৃদয় চিরন্তন প্রেমের জগতেই সদা নিষ্কৃতি পেতে চায়, জাগতিক সুখ তার কাছে ক্ষুদ্র মনে হয়। তাই তো নিজের বহুমূল্য সুবর্ণ মুক্তাদি খচিত বসন লুৎফ-উন্নিসা নির্দ্বিধায় দিতে পেরেছেন তার সেবিকা পেষমন্‌কে। এই পরিচ্ছেদের প্রথমেই উল্লিখিত হয়েছে—

''জনম অবধি হম রূপ নেহারনু নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনন শ্রুতিপথে পরশ না গেল।।
কত মধুযামিনী রভসে গোঁয়ায়নু না বুঝনু কৈছন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু তবু হিয়া জুড়ান না গেল।।
যত যত রসিক জন রসে অনুগমন অনুভব কাহু না পেখ।
বিদ্যাপতি কহে প্রাণ জুড়াইতে লাখে না মিলল এক।।''[৫] —বিদ্যাপতি।

সমগ্র উপন্যাসে শেক্সপীয়র, ডন জুয়ান, ম্যানফ্রেড, কীটস, বায়রণ, ওয়ার্ডওয়ার্থের মত পাশ্চাত্য সাহিত্যিকদের উক্তি যেমন ব্যবহৃত হয়েছে, ঠিক তেমনি কালিদাসের 'রঘুবংশ', 'রত্নাবলী', 'শকুন্তলা', 'কুমারসম্ভব', 'মেঘদূত', মধুসূদনের কাব্য 'মেঘনাদবধ কাব্য', 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য', 'বীরাঙ্গনা কাব্য', নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের 'নবীন তপস্বিনী'-র মত প্রাচ্য সাহিত্যের অনুষঙ্গও ব্যবহৃত হয়েছে। ঠিক এদেরই মত বিদ্যাপতির পদাবলীও ব্যবহৃত হয়েছে উনিশ শতকীয় উপন্যাসের প্রেক্ষাপটে।

বিদ্যাপতিকে প্রেম ও সৌন্দর্যের কবি রূপে অভিহিত করা হয়। বস্তুত শৃঙ্গার রসের পদরচনায় তাঁর কবি কৃতিত্ব সর্বাধিক। যৌবন আগমনের ফলে শ্রীরাধার চিত্তে যে প্রেম কৌতূহল উপস্থিত হয়, তাতে তার দেহ চেতনা ও মিলন স্পৃহা উজ্জীবিত করে তোলে। যৌবন জীবনের দ্বারে আঘাত করলে প্রেম যেন লৌকিক থেকে আধ্যাত্মিক জগতে উন্নীত হয়। বিদ্যাপতির পদে স্পষ্ট বলা হয়েছে জন্ম থেকে কেবল রূপ দর্শনের প্রতীক্ষা, মধুর বাণী শ্রবণের ইচ্ছা রাধার মত লুৎফ-উন্নিসার জীবনকে চঞ্চল করে তোলে। প্রিয় মিলনের দীর্ঘ অপেক্ষা, হৃদয়ের না জুড়ানো বেদনা শ্রীমতীকে যেমন প্রশান্তি দিতে পারেনি ঠিক তেমনি লুৎফ-উন্নিসার প্রাণকেও স্নেহধন্য করতে পারেনি। রাধার অপেক্ষা কৃষ্ণের জন্য। তেমনি তার অপেক্ষা নবকুমারের জন্য। যে নবকুমার প্রথম যৌবনে অজান্তেই তার সঙ্গে পৃথক হয়েছিল ঠিক তাকে পুনরায় পেতে, একটি সহজ, স্বাভাবিক সুস্থ দাম্পত্য জীবনের আশায় শ্রীরাধার মতই সেও উদগ্রীব হয়েছে সহজ, সরল নারীসত্তার আন্তরিক তাগিদেই। এখানে ঔপন্যাসিক বৈষ্ণবীয় মনস্তত্ত্বকে উপন্যাসের চরিত্রের অন্তর্লোক নির্মাণে ব্যবহার করেছেন। নাগরিক জীবনের বৈদগ্ধকে জীবনরসে নিমজ্জিত করে যেমন বিদ্যাপতি

উপস্থাপন করেছিলেন, ঠিক সেই অভিব্যক্তি জীবনরসিক লেখক বঙ্কিমের হাতে উঠে এসেছে। যে প্রেম দেহ থেকে শাশ্বত প্রেম প্রতিষ্ঠার বাণীকেই প্রকাশ্যে উন্মুক্ত করে। এছাড়াও মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য'- এর এক উক্তিতেও উপন্যাসের মধ্যে বৈষ্ণবীয় অনুষঙ্গ উপস্থিত হয়েছে।

''রাধিকার বেড়ী ভাঙ্গ, এ মম মিনতি।''[৬]

প্রসঙ্গত উদ্ধৃতিটি ব্যবহৃত হয়েছে চতুর্থ খণ্ডের 'প্রথম পরিচ্ছেদে: শয়নাগারে'। এই উক্তিটিও লুৎফ-উন্নিসা/মতিবিবির প্রসঙ্গেই উত্থাপিত হয়েছে। তার এই মনোভাব উদিত হয়। যখন তিনি আগ্রার সকল সুখ ত্যাগ করে নবকুমারের সঙ্গে সুখী দাম্পত্য জীবনের স্বপ্নময়তায় বিভোর থাকেন। 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' কবি মধুসূদনের বৈষ্ণব ভাবনাকেন্দ্রিক এক অন্যতম কাব্য সৃষ্টি। কাব্যে কৃষ্ণ উন্মত্তা রাধার বিলাপোক্তিই মূল বক্তব্যরূপে উপস্থাপিত হয়েছে। রাধার আক্ষেপানুরাগ ও মাথুরলীলার এক অতিসূক্ষ্ম ভাবগতির আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনায় সন্নিবিষ্ট আখ্যান এই কাব্যের বিষয় ও পদসমূহ বাংলা কাব্যের সাহিত্য ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। তিনি সেই পদ অবলম্বনে বৈষ্ণব কবিতার রীতিতেই অতি সরল ও মিত্রাক্ষর রীতির অনুসরণে রাধার বিরহ, বিলাপ, আক্ষেপ, হতাশা, ব্যাকুলতাকে এই কাব্যে যেভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন ঠিক সেই রীতিতেই এই কাব্যের উক্তি ব্যবহার করে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে লুৎফ-উন্নিসার নতুন সংসার বাসনা, জীবনসঙ্গীকে পাবার প্রবল বাসনা, বিরহ, উন্মত্ততাকে ব্যবহার করতে আধুনিক কবির বৈষ্ণব পদাবলীর ভাবনাকে ব্যবহার করেছেন। এখানে শ্রীমতি রাধা যেমন মর্ত্য মানবীর প্রতিমূর্তি, ঠিক তেমনি তিনিও নবকুমারের প্রথমা পত্নীরূপে বৈষ্ণব প্রেমাসক্ত এক নারীসত্তা। বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসের চরিত্র ভাবনায় ও মধ্যযুগীয় প্রসঙ্গ ব্যবহারে যেভাবে আধুনিক নারী হৃদয়ে মানবিক আবেগকে প্রোথিত করেছেন তা প্রকৃতপক্ষে রাধার বিরহবেদনার প্রতি মানবিক বোধের দ্বারা আকৃষ্ট হয়েই; তিনি এই বেদনা বিধুর প্রেম প্রসঙ্গের অবতারণায় ও বিদ্যাপতির পদের ব্যবহারে উপন্যাস ও চরিত্রকে গতি দিয়েছেন একথা সর্বাংশে সার্থক রূপেই বলা যায়। মানবাত্মা কামনা আত্মবশ্যতার স্বীকার, কিন্তু প্রেম সকল বশ্যতার ঊর্ধ্বে, বৈষ্ণব তত্ত্বদর্শনের এই 'আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি ইচ্ছা' এবং 'কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা'-র তত্ত্ব মানবীয় প্রবৃত্তি ও অন্তরাত্মাকে কাম থেকে চূড়ান্ত প্রেমের জগতে উন্নীত করেছে, এই উপন্যাসের সামগ্রিক প্রেক্ষিতে একথাই বলা যায়।

মৃণালিনী (১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দ):

'মৃণালিনী' উপন্যাসটি ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এটি উৎসর্গ

করা হয় নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রকে। ইতিহাস ও রোমান্স পর্যায়ে ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আরো এক গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস 'মৃণালিনী' বাংলায় তাতার তুর্কির আক্রমণের পটভূমিতে রচিত। এই উপন্যাসের উল্লেখযোগ্য চরিত্র হলেন হেমচন্দ্র, মৃণালিনী, মনোরমা এবং পশুপতি। যেখানে চরিত্রের বিশেষ কতগুলি অংশে বৈষ্ণবপদাবলীর তত্ত্বগত প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে। উপন্যাসটি সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী তাৎপর্য মণ্ডিত কাহিনী সমৃদ্ধ। 'কপালকুণ্ডলা'-য় রোমান্টিকতার যে সর্বাঙ্গসুন্দর ও মাধুর্যপূর্ণ এক সংগতি আছে, 'মৃণালিনী'-তে সেই সংগতির অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। কাহিনীর মধ্যে ইতিহাসকে প্রবল গতিতে উত্থাপিত করলেও তিনি অনৈতিহাসিক সাধারণ উপন্যাসের চরিত্রকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। 'কপালকুণ্ডলা'-য় মুঘল শাসনাধীন জাহাঙ্গীরের আমলের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলেও 'মৃণালিনী'-তে বাংলায় তাতার তুর্কি আক্রমণের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে ব্যবহার করা হয়েছে। তাই বলা যায়, 'মৃণালিনী' উপন্যাসে বাংলায় মুসলিম অভিযানের পটভূমিকায় একটি কাল্পনিক কাহিনী বর্ণিত হলেও কাহিনীগ্রন্থন ও চরিত্র চিত্রণে নরনারীর প্রেমের প্রাধান্যকে নৈপুণ্যের সঙ্গে ব্যাখ্যা করেছেন ঔপন্যাসিক।

উপন্যাসের চরিত্রগুলি বাস্তবতার নিরিখে তাই অনেক বেশি বিশ্বস্ত হয়েছে। হেমচন্দ্র ও মৃণালিনী এই দুই চরিত্রের প্রেম, জটিলতা পাঠকের হৃদয়কে স্পর্শ করেছে। 'মৃণালিনী'-র শান্তপ্রকৃতি ও ক্ষমাশীল মনোবৃত্তি, দুঃখজনক অভিজ্ঞতা ও তেজস্বিতাকে অনেক উচ্চমর্যাদা দিয়েছে। 'কপালকুণ্ডলা'-র তিন বছর পর রচিত এই উপন্যাসটিতে ইতিহাস ও প্রেমকে যেমন এক সুতোয় গ্রথিত করা হয়েছে, ঠিক তেমনি কাহিনী ও চরিত্রগুলি বাস্তবের প্রতিরূপে, স্নেহে, ভালোবাসায়, মনুষ্য প্রবৃত্তি ও প্রকৃতিতে সর্বত্র এক না হলেও শিক্ষা, সমাজ, অবস্থান, ও প্রেমময় প্রগাঢ়তায় মানব হৃদয়ের একটি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ বঙ্কিমচন্দ্র রচিত আলোচ্য উপন্যাসের মূল প্রকৃতিরূপে প্রকাশিত হয়েছে। মানব হৃদয়ের এই প্রেম প্রতিষ্ঠার স্বরূপ নির্ণয়ে লেখক এমন এক আবহ নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছেন, যেখানে বৈষ্ণবীয় চেতনার সুচারু আবেষ্টনে তা সমৃদ্ধ হয়েছে। রমণী হৃদয়ের এই বৈষ্ণব ভাবাশ্রিত আকূতি উপন্যাসকে যেমন নব প্রাণরস সঞ্চার করেছে, তেমনি নায়িকা মৃণালিনীর পাশে যথার্থ সঙ্গিনীরূপে গিরিজায়ার মত চরিত্র বায়ুবিক্ষিপ্ত তরঙ্গ মালার ন্যায় পাঠকচিত্তকে ভাবিয়ে তুলেছে। উক্ত উপন্যাসে বৈষ্ণব তত্ত্ব-দর্শনগত ছায়াপাত গিরিজায়ার তত্ত্বাবধানেই প্রকটিত হয়েছে। উপন্যাসের শুরুতেই যে দ্বন্দ্বের পরিস্থিতি তাতে দেখা যায় মৃণালিনী নায়ক হেমচন্দ্রের থেকে বিচ্ছেদ অবস্থায় দিনাতিপাত করেছেন। কারণ মৃণালিনীকে মাধবাচার্য মথুরা থেকে অন্যত্র নিয়ে গেছেন, ফলে হেমচন্দ্র তার সাক্ষাৎ পাননি। হেমচন্দ্র থেকে সে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকাকালীন

বিরহযন্ত্রণা উপলক্ষে তার সখী মণিমালিনীর সম্মুখে একটি কোমল কণ্ঠ নিঃসৃত মধুর সংগীত পরিবেশন করে—

''মথুরাবাসিনী মধুরহাসিনী
শ্যামবিলাসিনি রে''[৭]

আর এরপরই বাড়ির বাইরে থেকে আরো এক কণ্ঠধ্বনি অনুরণিত হয়—

''বৃন্দাবনধন, গোপিনীমোহন,
কাঁহেতু তেয়াগী, — রে;
দেশ দেশ পর, সো শ্যামসুন্দর,
শিরে তুয়া লাগি— রে।
বিকচ নলিনে, যমুনা— পুলিনে,
বহুত পিয়াসা— রে।
না মিটল আশারে।
.....
সা নিশা সমরি, কহ লো সুন্দরি,
কাঁহা মিলে দেখা— রে।
শুনি যাওরে চলি, বাজয়ে মুরলী,
বনে বনে একা রে।''[৮]

এভাবেই উপন্যাসে গিরিজায়া চরিত্রটির প্রবেশ একেবারে মৃণালিনীর হৃদয়ানুভবে রাধার মানসিকতাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। মৃণালিনীর মনে নায়ক হেমচন্দ্রের প্রতি বিরহ বেদনার এক অপূর্ব প্রেক্ষাপট এই সংগীত রাগিণীতে উঠে এসেছে। এভাবে গিরিজায়া প্রফুল্লতার সুন্দর প্রতিবিম্ব নিয়ে উপন্যাসে প্রথম উপস্থিত হয় লক্ষ্মণাবতীতে হৃষীকেশ শর্ম্মার বাড়িতে মৃণালিনী ও মণিমালার কথোপকথন কালে। চরিত্রটির রূপ বর্ণনায় পাওয়া যায় খর্বাকৃতি, ষোড়শী প্রফুল্লা, স্মিতনেত্রা তিলকধারী ভিখারিণীর বেশে, যেন চণ্ডীদাসের গৈরিক বসনা রাধার রূপে অপরূপা নারী। বৈষ্ণব কবিগানে ঔপন্যাসিক এমন এক আবহ রচনা করেছেন, যেন বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে ত্যাগ করে চলে গেছেন, আর শ্রীরাধাও কৃষ্ণ অদর্শনে যেভাবে আক্ষেপানুরাগে উন্মত্ত হয়েছে, ঠিক সেই অনুরূপ ভাবনার, অতৃপ্ততাই পদমধ্যে উচ্চারিত হয়েছে। এভাবেই বৈষ্ণবীয় প্রসঙ্গের অবতারণা প্রত্যক্ষভাবে উপন্যাসের ক্রমোন্নতিকে সূচিত করেছে।

গিরিজায়া আনন্দময়ী চঞ্চলরূপী। ভিখারিণী হওয়ায় সে প্রলুব্ধচিত্ত, সদা হাস্যময়ী, চিন্তামুক্ত, সহায়সম্বলহীন। তীক্ষ্ণবুদ্ধিমতী, প্রত্যুৎপন্নমতি, অনেকাংশেই 'দুর্গেশনন্দিনী'র বিমলার সঙ্গে সমতুল্য। তিনি সরস রসিকতার মধ্য দিয়ে বৈষ্ণবীয় পদের সমাহারে দিগ্বিজয়ী প্রেমকে মৃণালিনীর সেবার মধ্য দিয়ে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। মৃণালিনীর সঙ্গে পরিচিত হবার পর তার সব কাজই সে মৃণালিনীর জন্য উৎসর্গ করেছে। তাইতো শ্রীরাধার সখীর মত সেও মৃণালিনীর সখী রূপে মিলনক্ষেত্র রচনার প্রতিবেশ তৈরি করে বৈষ্ণবীয় সাধনার 'গোপীতত্ত্ব'-এর স্মরণ করিয়েছেন।

''মথুরাবাসিনি, মধুর হাসিনি, শ্যামবিলাসিনি— রে।
কহলো নাগরি, গেহ পরিহরি, কাহে বিবাসিনী— রে।।
বৃন্দাবনধন, গোপিনীমোহন, কাহেতু তেয়াগী— রে।
দেশ দেশ পর, সো শ্যামসুন্দর, ফিরা তুয়া লাগি—রে।।
বিকচ নলিনে, যমুনাপুলিনে, বহুত পিয়াসা—রে।
চন্দ্রমাশালিনী, যা মধুযামিনী, না মিটল আশা— রে।।''[৯]

গিরিজায়ার এই গীত উচ্চারণে স্পষ্ট ভাবে মথুরা-বাসিনী রাধার শ্যাম বিহনে অতৃপ্ত মধু যামিনী, কামনা লেশশূন্য নিঃস্বার্থ প্রেমের অবিমিশ্র প্রতীক্ষার রূপ উঠে এসেছে, ঠিক যেভাবে রাধা প্রিয়তমার বহুদিনের অদর্শনে বিরহকে প্রকাশ করেছে, ঠিক সেই অনুরূপ মনোবেদনা তার জীবনেও কোন না কোন পর্বে ঝংকৃত হয়েছে। গিরিজায়ার আরো একটি গানে শ্রীরাধার বিরহ আকূতি প্রকাশিত হয়েছে—

''যমুনার জলে মোর, নিধি কি মিলিল।
ঝাঁপ দিয়া পশি জলে, যতনে তুলিয়া গলে,
পরেছিনু কুতূহলে যে রতনে।।''[১০]

ঢিমে তেতালা তাল যোগে জয়জয়ন্তী রাগিণীতে গীত গানটিতে সেই একই ভাবে রাধার চিত্তদীর্ণ তীব্র আকুলতা প্রকাশিত হয়েছে। যেখানে শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীমতি রাধা নিজপ্রাণের পরোয়া না করেই যমুনার জলে ঝাঁপ দিয়ে উদ্ধার করে মিলিত হতে চেয়ে বিহ্বল হয়ে পড়েছেন। সেই রাধার সখী রূপা গিরিজায়াই যেন প্রিয় বিরহের কালে মৃণালিনীকে মানসিক আশ্রয় দিতে সমর্থ হয়েছেন।

এই উপন্যাসের আরো এক সন্ধিক্ষণে নায়িকা মৃণালিনীর সংলাপে অভিসারিকা রাধার চিত্তব্যাকুলতা প্রকাশিত হয়েছে। পদাবলী সাহিত্যে শ্রীরাধার অভিসারই সমগ্র লীলাতত্ত্বের মেরুদণ্ড। অভিসারে তাঁর গৃহশৃঙ্খল, লোকলজ্জার ভয়, সংসারধর্ম, পরিজন-গুরুজনের ভয় যেমন নিমেষেই

তিরোহিত হয়েছে, ঠিক সেই প্রকার অভিসারিকা রাধার মনোভাব আমরা মৃণালিনীর সংলাপে লক্ষ করি—

''কন্টক গঠিল বিধি, মৃণাল অধমে।
জলে তারে ডুবাইল পীড়িয়া মরমে।।
রাজহংস দেখি এক নয়নরঞ্জন।
চরণ বেড়িয়া তারে, করিল বন্ধন।।
বলে, হংসরাজ কোথা করিবে গমন।
হৃদয় কমলে মোর, তোমার আসন।।
আসিয়া বসিল হংস হৃদয়কমলে।
কাঁপিল কন্টক সহ মৃণালিনী জলে।।"[১১]

সখী গিরিজায়ার সম্মুখে তার এই হৃদয়দীর্ণ গাথা পরিবেশনের মধ্য দিয়ে মৃণালিনী যেন শ্রীরাধার ন্যায় প্রিয়বিহনে গৃহত্যাগী বিবাগী হয়ে তার স্বামী হেমচন্দ্রকে এক পলকের দর্শনে ইহজীবনকে কৃতার্থ করতে চান। এরই মধ্যে হেমচন্দ্রও মৃণালিনীর অদর্শনে ব্যাকুল হয়েছে, গিরিজায়ার সম্মুখে সে বলেছে— সে মৃণালিনীকে অনুসন্ধান করে তার সান্নিধ্য পেতে চান। প্রত্যুত্তরে গিরিজায়া তাকে কৃষ্ণ অনুরূপ নায়কের সঙ্গে তুলনা করেছেন। নিম্নোক্ত উক্তির মধ্যে দিয়ে—

''শুনি যাওয়ে চলি, বাজয়ি মুরলী, বনে বনে একারে।"[১২]

উপন্যাসে গিরিজায়া চরিত্রটির মধ্যেও এক বৈষ্ণবীয় প্রেম প্রবৃত্তি পরিলক্ষিত হয়। মৃণালিনীর দাসী হয়েও চরিত্রের দৃপ্ত ব্যক্তিত্বে সে উপন্যাসে বিশুদ্ধ প্রেম পূজারিণী হয়ে উঠেছেন। মৃণালিনী ও হেমচন্দ্রের মিলনে তিনি প্রায় দূতীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে প্রেমিকা শ্রেষ্ঠা মৃণালিনীর বিকশিত প্রেমের পূজা করেছেন সর্বত্র। গিরিজায়ার মনেও প্রেমাস্পদের জন্য একপ্রকার অন্যরূপ আকুলতা লক্ষিত হয়েছে। সেও যেন প্রায় শ্রীমতির অভিসার যাত্রার মতোই নবদ্বীপ যেতে চান প্রিয় অন্বেষণের তাগিদে, যা একই সঙ্গে মৃণালিনীর মথুরা অভিসারকেই পূর্ণতা দিয়েছে—

''মেঘ দরশনে হায়, চাতকিনী ধায় রে।
সঙ্গে যাবি কে কে তোরা আয় আয় আয় রে।
মেঘেতে বিজলি হাসি, আমি বড় ভালোবাসি।
যে যাবি সে যাবি তোরা, গিরিজায়া যায় রে।।"[১৩]

গোবিন্দদাসের রাধার এই অভিসার যাত্রার প্রতিফলন এই সকল উক্তির মধ্যদিয়ে প্রগাঢ় রূপে দেখা যায়। ঠিক তেমনি প্রেমাবেগের চূড়ান্ত পরিণতিতেই বৈষ্ণবী গিরিজায়াও তাই নবদ্বীপের উদ্দেশ্যে গমন করেছেন। এই যাত্রায় মৃণালিনীও তার সঙ্গী রূপে নদীয়ায় হেমচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে গমন করেন। তখন গিরিজায়ার কণ্ঠে উঠে আসে—

''চরণতলে দিনু হে শ্যাম পরাণ রতন।
দিব না তোমারে নাথ মিছার যৌবন।।
এ রতন সমতুল, ইহা তুমি দিবে মূল,
দিবা নিশি মোরে নাথ দিবে দরশন।।''[১৪]

এ যেন পূর্ণাঙ্গ আত্মসমর্পণের নিবেদিত অর্ঘ্য। যেমন কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে শ্রীরাধার আত্মসমর্পণ। ঠিক সেভাবেই প্রেমভক্তি, চিন্তাশূন্যতা, চপলতা এই সকল বৈষ্ণবভাবাশ্রিত পদ উচ্চারণের মধ্য দিয়ে গিরিজায়ার ব্যথিত হৃদয়ের বিরহানল স্পষ্ট প্রতিবিম্বত হয়েছে। সখী মৃণালিনীর হৃদয়ের চিত্ত চঞ্চলতা উপলব্ধির স্থান থেকেই গিরিজায়ার গানে এই রহস্যময়তা ও রঙ্গ রসিকতার উদ্রেক হয়েছে—

১. ''কাহে সই জীয়ত মরত কি বিধান?
ব্রজকি কিশোর সই, কাঁহা গেল ভাগই,
ব্রজ টুটায়ল পরাণ।।''[১৫]

২. ''নহে-শ্যাম শ্যাম শ্যাম শ্যাম শ্যাম নাম জপয়ি
ছার তনু করব বিনাশ।''[১৬]

হেমচন্দ্র গিরিজায়ার গানে অসন্তুষ্ট হয়ে বারবার মৃণালিনীর সংবাদ জানতে চান, সে তার উৎকণ্ঠাকে বুদ্ধি করে শেষে গিরিজায়া মৃণালিনীর সংবাদ জানান। এমনকি মৃণালিনীর লিপি হেমচন্দ্র খণ্ড খণ্ড করে ছিন্ন করলে গিরিজায়া বাড়ি এসে বেদনার্ত হৃদয়ে পুষ্করিণীর ধারে উপবেশন করে মনঃকষ্টে গাইতে লাগলেন—

''পরান না গেলো।
যো দিন পেখনু সই যমুনাকি তীরে,
গায়ত নাচত সুন্দর ধীরে ধীরে,
ওঁহি পর পিয় সেই, কাহে কালো নীরে,
জীবন না গেলো?

ফিরি ঘর আয়ুন না কহনু বোলি,
তিতায়নু আঁখিনীরে আপনা আঁচোলি,
রোই রোই পিয় সই কাহে লো পরানি,
তইখন না গেলো?
শুননু শ্রবণ-পথে মধুর বাজে,
রাধে রাধে রাধে রাধে বিপিন মাঝে,
... ...
লটায়নু কাঁদি সই শ্যাম পদমূলে,
সোহি পদমূলে রই, কাহে লো হামারি,
মরণ না ভেল?"[১৭]

এই সকল গীতের মধ্য দিয়ে গিরিজায়া মৃণালিনীর জন্য সহানুভূতি প্রকাশ করেছে। তাদের এই রূপ গোপী সহ শ্রীরাধার প্রতিরূপকেই স্মরণ করায়। গিরিজায়া ও দিগ্বিজয়ের প্রণয়পাত্র রূপে নিজেকে গড়ে তোলে। তাকে দেখার জন্য মৃণালিনীর সঙ্গে সেও নবদ্বীপে যাত্রা করে। হেমচন্দ্র ও মৃণালিনীর মিলনে সে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সেটাই তার পূর্ণ পরিচয় নয়, নারী হৃদয়জাত অনুভূতিতে, প্রণয়ে তার বক্ষে প্রজ্জ্বলিত প্রেমবহ্নির দাবদাহ অনুভব করাতে পাঠকের কাছে সে যথার্থ সফল হয়েছে। উপন্যাসে তার পরিচয় শুধুমাত্র সেবিকা রূপে নয়, প্রেমিক পুরুষ রূপে দিগ্বিজয়কে পাবার আকুলতাও তাকে ব্যতিক্রমী নারীসত্তার পরিচয় প্রদান করেছে। তাই তার সংগীত উপস্থাপনা, রসালাপ, মৃণালিনীর প্রতি সেবাদানে, নিজ হৃদয়ের প্রেমপাত্রের সন্ধানে নিবিষ্ট চিত্তে পর্যালোচনা করলে অদ্ভুত চারিত্রিক সামঞ্জস্যে পদাবলীর ভাব প্রতিবেশে সহৃদয় পাঠক বারম্বার মুগ্ধ হয়ে যান। হেমচন্দ্র, মৃণালিনীর প্রেমে দূতীর ভূমিকা নেওয়া তার চারিত্রিক মহিমাকে খানিক নিষ্প্রভ করলেও সততায়, মৃণালিনীর প্রতি মমত্বে, স্নেহে তিনি উপন্যাসে বিশেষ মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়েছেন।

উপন্যাসে ব্যবহৃত বৈষ্ণব ভাবাশ্রিত গানের ভাষাগত দিক লক্ষ করলে বিদ্যাপতির ব্রজবুলি ও চৈতন্যোত্তর পদকর্তা গোবিন্দদাসের অনুকরণীয় ভাষাশৈলী পরিলক্ষিত হয়। কারণ বাংলার পাশাপাশি মৈথিলী, উড়িয়া, আসামী প্রভৃতির মিশ্রিত রূপে এই ভাষার সৃষ্টি। এই ভাষার যে ঔদার্য ও আতিথ্য সুললিত ছন্দ মাহাত্ম্য তা উপন্যাসে ব্যবহৃত গীত মধ্যে ফুটে উঠেছে। বৈষ্ণব সাহিত্য অভিসারের অতি দুর্গম, বিঘ্ন-সঙ্কুল, দুর্গমতাকে অতিক্রম করে এক সাধনার মধ্য দিয়ে শ্রীরাধা

যেরূপ অভীষ্ট লক্ষ পথে এগিয়ে গেছেন, আর সখীরা তাকে উৎসাহিত করেছেন ঠিক সেভাবেই গিরিজায়া মৃণালিনীর উদ্দেশ্যে নিঃস্বার্থ সেবাপরায়ণতায় ব্রতী হয়েছিলেন। উপন্যাসের নায়ক নায়িকার মিলনে গিরিজায়া যেরূপ আত্মতৃপ্ত ও আনন্দধারায় অবগাহিত হয়েছেন তা তাকে উপন্যাসে শ্রেষ্ঠ সহচরী রূপে পরিচিতি দিয়েছে। রাধার সুখে সখীরা যেরূপ সুখী ছিলেন, মৃণালিনীর সুখ বিধানে গিরিজায়ার মত সেবিকা সখীও সমপ্রাণা নারী রূপে প্রকৃত অর্থেই উপন্যাসের মাত্রাকে বহুগুণে সমৃদ্ধ করেছে। বিদ্যাপতির লেখনীতে সখী ভাবনার অপূর্ব নিদর্শন স্বরূপ বৈষ্ণব সাহিত্যে যেরূপ সমাদৃত, আধুনিক যুগের লেখক বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবনায় গিরিজায়া চরিত্রে সেই 'সখীতত্ত্ব'-এরই ছায়াপাত প্রতিফলিত হয়েছে।

তাই পরিশেষে এ কথাই বলা যায় যে বৈষ্ণব পদসাহিত্যে গোপীপ্রেমের স্বরূপ বর্ণনায় স্পষ্ট বলা হয়েছে সখীরা স্ব-সুখ বাসনা ত্যাগ করে সর্বশ্রেষ্ঠা গোপী রাধার প্রেমকে কৃষ্ণ মিলনের মধ্য দিয়ে যে মাধুর্য আস্বাদন করে তৃপ্ত হন, সেইরূপ আত্মসুখ বাঞ্ছা বিসর্জনের মধ্য দিয়েই তারা বিশেষ মর্যাদায় অভিষিক্ত হন। বৈষ্ণব পদসাহিত্যে রাধার পূর্বরাগ থেকে ভাব সম্মিলনের প্রেক্ষাপট রচনায় সখীগণের যে ভূমিকা, আলোচ্য উপন্যাসেও গিরিজায়ার মধ্য দিয়ে মৃণালিনীর প্রেমকে হেমচন্দ্রের সঙ্গে মিলন পর্যন্ত একই প্রতিরূপে অনুভূত হয়েছে। সেই সঙ্গে মৃণালিনীকে বঙ্কিমচন্দ্র সরাসরি বৈষ্ণবীয় পরিমণ্ডলে রচনা করে তাকে এক প্রকার সখী রূপেই উপন্যাসে স্থান দিয়ে এই তত্ত্ব-দর্শনগত ভিত্তিতে আরো বেশি মজবুত করেছেন। নায়ক নায়িকার মিলন প্রসঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের এই সিদ্ধান্তকে প্রামাণ্য রূপে উপস্থাপন করে এ কথা স্পষ্টভাবে বলা যায়—

''কৃষ্ণ সহ রাধিকার লীলা যে করায়।
নিজ কেলি হৈতে তাহে কোটি সুখ পায়।।''[১৮]

মৃণালিনীর মধ্যেও নিতান্ত শান্ত, ক্ষমাশীলা নারীরূপে শ্রীরাধার প্রতিচ্ছবিকে পরিলক্ষিত হতে দেখেছি। বিশেষত, গিরিজায়ার সংগীত শ্রবণে তার যে হৃদয় বিহ্বলতা তা কৃষ্ণ অদর্শনে বা মিলনাকাঙ্ক্ষায় উদ্বেলিত রাধার মানসিকতার সমগোত্রীয়, ঐতিহাসিক ও রোমান্টিক প্রেক্ষাপটে বৈষ্ণবীয় চেতনা, তত্ত্বানুষঙ্গকে ঔপন্যাসিক এমন সুন্দর ভাবে মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন, তাতে আধুনিক পাঠকবর্গের সুচারু মননশীল আত্মাকে বহুলাংশে প্রভাবিত করেছে। একথা নিঃসন্দেহে বলার দাবি রাখে। 'মৃণালিনী' হেমচন্দ্রের পরিণীতা হয়েও যে অদৃষ্ট দোষে হেমচন্দ্রের গৃহিণী হতে পারলেন না, তা কোথাও যেন শ্রীরাধার কৃষ্ণ বিচ্ছেদে বিরহবার্তার সমগোত্রীয়, তত্ত্বানুষঙ্গে যা বৈষ্ণবীয় 'প্রেমবিলাস-বিবর্ত'-এর আলেখ্যকে আধুনিক উপন্যাসের রূপাঙ্গিক বিশ্লেষণে প্রজ্জ্বলিত করেছে,

একথা বললে অত্যুক্তি হয় না।

বিষবৃক্ষ (১৮৭২-১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দ):

'বিষবৃক্ষ' বঙ্কিমচন্দ্রের চতুর্থ বাংলা উপন্যাস এবং প্রথম সামাজিক উপন্যাস রূপে বাংলা কথাসাহিত্যে এক বিশেষ মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়ে আছে। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় বারোটি সংখ্যায় প্রকাশিত হতে থাকে; ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে পুস্তক হিসেবে এর মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতাবস্থায় ১৮৯২ পর্যন্ত এর প্রায় আটটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটি উৎসর্গ করা হয় বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুকে। বহু সমালোচক উপন্যাসটিকে বাংলা সাহিত্যের প্রথম মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের আখ্যায় আখ্যায়িত করেছেন। মূলত উপন্যাসটি সামাজিক শ্রেণিভুক্ত বলে বিবেচিত হয়েছে। উপন্যাসটিতে জীবনের গভীর রসাত্মক অথচ বিষাদময় পরিবর্তনকে ইঙ্গিতায়িত করা হয়েছে। জীবনের রূপতৃষ্ণা, রমণীর রূপে মোহাবিষ্ট পুরুষ প্রবৃত্তির দর্শন অক্ষমতাকে এক প্রবল অন্তর্বিরোধের সঙ্গে, গভীর অথচ সূক্ষ্ম মর্মস্পর্শিতাকে রুদ্ধশ্বাস গতিবেগে অভাবনীয় ভাবে উপস্থাপিত করেছেন ঔপন্যাসিক। আমাদের আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে বৈষ্ণবীয় তত্ত্ব দর্শনের ভাব তন্ময়তা কতটা প্রগাঢ় ভাবে জড়িত তার সূক্ষ্ম অন্বেষণ।

উপন্যাসটি রচনার মধ্য দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র শাশ্বত শিল্পী হৃদয় থেকে জীবনের অনিবার্য ধর্মকে বিশ্লেষণ করতে চেয়েছিলেন। মানব জীবনের নানা জটিল, চিররহস্য ঘন আবরণকে ভালো, মন্দে, সরল, জটিল বিস্ময়কর রূপে উন্মুক্ত করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যাসে কোথাও প্রেমের আকুলবহ্নি, কোথাও এর স্বর্ণদীপ্ত মহিমা আবার কোথাও কামনার কুটিল চিহ্নকে প্রকাশিত করেছেন। উপন্যাসে ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের মধ্য দিয়ে তার প্রকৃতিগত নানা শাখা-প্রশাখা বিষফল স্বরূপে উদঘাটিত হয়েছে। মূলত সেখানে চিত্তশুদ্ধি, আত্মসংযমের অভাব জনিত বিষফল প্রসবের চিত্রকে স্পষ্টতা দেওয়া হয়েছে। জীবনের নানা পর্ব, অতিপর্ব, উপপর্বকে নানা অভিজ্ঞতায় সঞ্জাত করে অন্তরাত্মা শুদ্ধির কথা ব্যক্ত করেছেন। লেখকের এই শুদ্ধির প্রেরণা আত্মপ্রত্যয়ের গভীর স্তর থেকে উদ্ভূত হয়, বঙ্কিমচন্দ্র নিজস্ব জীবন দর্শনকে যেভাবে শিল্পরূপ প্রদান করেছেন ঠিক তাঁর সেই মানস সভায় তিনি উপন্যাসের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন, যার ভিত্তি নির্মিত হয়েছে মানবকল্যাণের দৃঢ় সাধকের প্রত্যয় থেকে। তাঁর মত ক্রান্তদর্শী মনীষী 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের মধ্য দিয়ে বিষবৃক্ষের বীজ, অঙ্কুর, ফল ও ফলের পরিণতিকে অপূর্ব শিল্পমূর্তিতে আত্মপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। শিল্পীর সত্যতা সেখানে সর্বত্রই রক্ষিত হয়েছে। আমাদের বক্তব্য বা উপজীব্য বিষয় বৈষ্ণবীয় ভাবাদর্শগত তাত্ত্বিক অনুসন্ধান।

এই তত্ত্ব বিশ্লেষণের পূর্বে আমরা 'বিষবৃক্ষ'-এর কাহিনীর দিকে সংক্ষেপে দৃষ্টিপাত করতে পারি। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের অন্যতম আকর্ষণ হল এর গল্প। অনেকটা নাট্যিক আঙ্গিকে পরিবেশিত তাঁর এই অভিনব উপন্যাস শৈলীর উপস্থাপনা। মূলত দুটি সামাজিক সমস্যা সেখানে উঠে এসেছে। এক হল বিধবাবিবাহ ও অন্যটি বহুবিবাহ, একদিকে হিন্দু ধর্মের পুনরুত্থান, অন্যদিকে সূর্যমুখী চরিত্রের মাধ্যমে এর কুফলকে তুলে ধরা হয়েছে। উপন্যাসের কাহিনী শুরু হয়েছে নগেন্দ্রর নৌকাযাত্রা অবলম্বনে। আরোহী ও গল্পের নায়ক দুইই নগেন্দ্র। ঔপন্যাসিক প্রথম পরিচ্ছেদে বলেছেন—

''নদীর জল অবিরল চলচল চলিতেছে-ছুটিতেছে বাতাসে নাচিতেছে— রৌদ্রে হাসিতেছে— আবর্তে ডাকিতেছে।''[১৯]

নৌকায় স্থির হয়ে তিনি স্ত্রী সূর্যমুখীর স্মৃতিতে বিভোর। এই নগেন্দ্র চরিত্রের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসের বীজমন্ত্রকে প্রোথিত করেছিলেন। সেই সঙ্গে ঝড়ের রাত্রিতে দীপালোক লক্ষ্য করে নগেন্দ্র এক ভগ্ন প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করেন; সেখানেই প্রথম সাক্ষাৎ হয় এক বালিকা যার নাম কুন্দনন্দিনী। ঘটনাক্রমে কুন্দনন্দিনীর ভাগ্য নগেন্দ্রর সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। সময়ের ক্রমবর্ধমান গতিধারা অন্যদিকে স্বাভাবিক হৃদয়বৃত্তির আকর্ষণে নগেন্দ্র ও কুন্দনন্দিনী পরস্পর পরস্পরের দিকে ধাবিত হয়। সূর্যমুখীর দূরসম্পর্কীয় ভাই তারাচরণের সঙ্গে কুন্দর বিবাহ, অকাল বৈধব্য, নগেন্দ্র ও সূর্যমুখীর সোনার সংসারে প্রবেশ, দাসী হীরার সঙ্গে পরিচয়, কুন্দের বৈধব্য পরবর্তী জীবনে স্থায়ীভাবে নগেন্দ্রর গৃহে আশ্রয় লাভ—এই সংক্ষিপ্ত পরিসরেই কাহিনীর জটিলতম পট নির্ধারিত হয়েছিল। ক্রমশ নগেন্দ্রনাথের চিত্তাসক্তি, অপ্রাপ্তি জনিত ক্রোধ, মত্ততা, কর্মে অনাসক্তি, ক্ষতবিক্ষত হৃদয়চিহ্ন উপন্যাসের একবিংশ পরিচ্ছেদে উৎকণ্ঠার সূচনা করেছে।

''তোমাতে আমার আর সুখ নাই— কুন্দনন্দিনীকে সন্ধান করিয়া আমি দেশ দেশান্তরে ফিরিব। ... আমি অন্যগত প্রাণ হইয়াছি— সে কথা তোমাকে স্পষ্ট বলিব; এখন আমি দেশত্যাগ করিয়া চলিলাম।''[২০]

এরপর নগেন্দ্র, কুন্দনন্দিনীর বিবাহ, অকস্মাৎ সূর্যমুখীর গৃহত্যাগ, নগেন্দ্রর অনুশোচনা, সূর্যমুখীর মৃত্যু সংবাদ, নগেন্দ্রর সর্বসুখের পরিসমাপ্তি, কালক্রমে তার সূর্যমুখীকে প্রাপ্তি, চিরকালের মত কুন্দনন্দিনীকে হীরা দাসীর প্রদত্ত বিষে মৃত্যুবরণ করতে হল। প্রেমের এক স্নিগ্ধ প্রতিচ্ছবি উপন্যাসে অঙ্কিত হয়েছে। এক মঙ্গলময় বার্তা সেখানে নানা প্রতিকৃতিতে উঠে এসেছে। নগেন্দ্র ও সূর্যমুখীর কল্যাণার্থে আত্মত্যাগ করেছিল, ঠিক অনুরূপ ভাবে সূর্যমুখী নগেন্দ্রর ইচ্ছেকে সম্মান

জানিয়ে তার সঙ্গে কুন্দর বিবাহ দিয়েছিল। দুই নারীর প্রেমকে বৈষ্ণবীয় প্রেক্ষাপটে কিভাবে আমরা সংযুক্ত করতে পারছি, তা ক্রমশ আলোচনায় বিশ্লেষিত হবে।

এখানে প্রেমময় সত্তার ভোগলিপ্সার উন্মত্ততা যেমন একদিকে প্রকাশিত, তেমনি কামনার কুটিল, ঈর্ষাকাতর, শঠ, ছলনা; অন্যদিকে প্রকাশিত ব্যর্থ কামনার আক্রোশ, হত্যা, ষড়যন্ত্র। দেবীপুরের দুশ্চরিত্র জমিদার দেবেন্দ্রর মধ্যে কলকাতার আধুনিক 'বাবু' সভ্যতার ছাপ যেমন স্পষ্ট, পাশাপাশি মদ্যাসক্তি, উৎশৃঙ্খলতা, পাপাচারে জর্জরিত নানা আঙ্গিক উঠে এসেছে। কুন্দনন্দিনীর প্রতি তিনি আকৃষ্ট ছিলেন। সেই আকর্ষণের টানে দেবেন্দ্র হরিদাসী বৈষ্ণবী সেজে দত্ত গৃহে যাতায়াত শুরু করেন। কিন্তু কুন্দ তার সেই আকর্ষণে বিন্দুমাত্র প্রভাবিত হন না। দেবেন্দ্রর সে হতাশা ঈর্ষা, শ্লেষে পরিণত হয়। এদিকে নগেন্দ্রের গৃহের পরিচারিকা হীরা এক প্রলয় সন্ধ্যায় দেবেন্দ্রর জালে পতিত হয়। এবং রূপমুগ্ধ ও ভোগতৃষ্ণায় নিমজ্জিত হীরা শেষে প্রবৃত্তির কাছে আত্মসমর্পণ করে। এ প্রসঙ্গে উপন্যাসে ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদে যথার্থই বলা হয়েছে—

''হীরা চিত্তসংযম করিতে জানিত, কিন্তু তাহাতে তাহার প্রবৃত্তি ছিল না বলিয়া, সহজে পতঙ্গবৎ বহ্নিমুখে প্রবেশ করিল। দেবেন্দ্রকে অপ্রণয়ী জানিয়া চিত্ত সংযমে প্রবৃত্তি হইয়াছিল, তাহাও অল্পদূর মাত্র; কিন্তু যতদূর অভিলাষ করিয়াছিল, ততদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিল।... এই অপ্রবৃত্তি হেতু বিষবৃক্ষে তাহার ভোগ্য ফল ফলিল।''[২১]

নানা ঘটনাক্রমে উপেক্ষিতা কুন্দ হীরা প্রদত্ত বিষ ভক্ষণ করে আত্মহত্যা করে। উপন্যাসের পরিসমাপ্তিতে তাই দুটি ত্রিকোণ প্রেমের প্রতিচ্ছবি উঠে আসে একদিকে নগেন্দ্র, কুন্দনন্দিনী, সূর্যমুখী, অন্যদিকে দেবেন্দ্র, হীরা, কুন্দনন্দিনী।

এছাড়াও উঠে এসেছে শ্রীশচন্দ্র, কমলমণির প্রেমের প্রসঙ্গ। সম্পর্কে কমলমণি নগেন্দ্রনাথের ভগ্নী। কমলমণির মধ্যে বঙ্কিম এক প্রেমের আলোকময়ী রূপকে তুলে ধরেছেন। উপন্যাসের জটিল ঘূর্ণাবর্তে দাঁড়িয়ে তিনি সত্যই এক স্নিগ্ধ রূপের জ্যোর্তিকণা বিকিরণকারী নারী মূর্তি। বাৎসল্য রূপেও তিনি সমান আলোকছটা প্রদর্শন করেছেন।

বৈষ্ণবীয় চিন্তাচেতনার প্রত্যক্ষ প্রভাবের ক্ষেত্রে প্রথমেই উঠে এসেছে নবম পরিচ্ছেদের কথা। অধ্যায়ের নাম হরিদাসী বৈষ্ণবী। বিধবা কুন্দনন্দিনী নগেন্দ্রর গৃহে কালাতিপাত করার সময় একদিন—

''জয়রাধে বলিয়া এক বৈষ্ণবী আসিয়া দাঁড়াইল। .... নগেন্দ্রর ঠাকুরবাড়ীতে নিত্য অতিথিসেবা হইত এবং তদ্ব্যতীত সেইখানেই প্রতি রবিবারের তুন্ডলাদি বিতরণ হইত ... স্ত্রীলোকের

মধ্যে একজন বয়োজ্যেষ্ঠা কহিল, ''হ্যাঁ গা তুমি কে গা?'' বৈষ্ণবী কহিল, ''আমার নাম হরিদাসী বৈষ্ণবী।''[২২]

সে একটি গান শোনাতে চায়। কুন্দ অত্যন্ত গীত-প্রিয় হওয়ায় স্বভাবতই গান শুনতে আগ্রহী হয়। কেউ কৃষ্ণবিষয়ক গান, কেউ সখী সংবাদ, কেউ গোষ্ঠ প্রভৃতি গানের ফরমাস শুরু করেন। হরিদাসী বৈষ্ণবী খঞ্জনী সহযোগে সতৃষ্ণ বিলোল নেত্রে কুন্দনন্দিনীর পানে চেয়ে কীর্তন গাইলেন—

''শ্রীমুখপঙ্কজ— দেখবো বলে হে,
তাই এসেছিলাম এ গোকুলে।
আমার স্থান দিও রাই চরণতলে।
... ...
ব্রজের সুখ রাই দিয়ে জলে,
বিকাইনু পদতলে,
এমন চরণনূপুর বেঁধে গলে,
পশিব যমুনা-জলে।''[২৩]

এই সংগীত শ্রীরাধিকার চিত্তের কৃষ্ণ প্রেমে যে প্রবল অন্তর্দহন, কৃষ্ণের চরণতলে আশ্রয় প্রার্থনার মধ্যে দিয়ে সে তাঁর চরণদাসী হয়ে, সমস্ত জীবন নয়নভরে দর্শনের আস্বাদ গ্রহণ করতে চান। কৃষ্ণের অদর্শনে রাধা নিজের প্রাণ যমুনার কৃষ্ণ জলে বিসর্জন দিতেও বিন্দুমাত্র দ্বিধান্বিত নন। ব্রজের সমস্ত সুখকে রাই জলে নিমজ্জিত করে, নিজ নূপুর গলায় বেঁধে যমুনার জলে আত্মঘাতী হতে চেয়েছেন।

বৈষ্ণবী কুন্দনন্দিনীকে নিয়ে দেশান্তরী হতে চাইলে কুন্দ কোনভাবেই রাজী হননি। সকলেই হরিদাসীর সঙ্গীত পারদর্শিতার গুণে তার সুখ্যাতি করে। এই বৈষ্ণবী প্রকৃতপক্ষে কোন নারী চরিত্র নয়, তিনি আসলে দেবীপুরের জমিদার দেবেন্দ্রবাবু। প্রকৃতপক্ষে আমরা হরিদাসী ওরফে দেবেন্দ্রর মধ্য দিয়ে স্বল্প পরিসরে বৈষ্ণবীয় অনুষঙ্গকে খুঁজে পেয়েছি ঠিকই তবে অন্যান্য চরিত্রের ন্যায় এটি কোন বাস্তবগ্রাহ্য চরিত্র নয়, একটি ছদ্মবেশী চরিত্র কিন্তু দেবেন্দ্রর মধ্যে বঙ্কিম স্ত্রীর অধিকার ও চিত্তদীর্ণ তীব্র আকুলতাকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। এমনকি, কুন্দকে পাবার জন্য যে ছদ্মবেশ তা প্রেমবস্তুকে পাবার নির্মমতার স্থান থেকেই দেবেন্দ্রর স্বভাব প্রকৃতিতে স্থান পেয়েছে, অন্যদিকে কুন্দনন্দিনীর মনে প্রেম পতঙ্গবহ্নি সমানভাবে প্রজ্জ্বলিত করতে প্রচ্ছন্নভাবে হলেও তিনি সমর্থ

হয়েছিলেন। উপন্যাসের একটি স্থানে যখন হরিদাসী বৈষ্ণবী-রূপী দেবেন্দ্র কুন্দকে নিয়ে দেশান্তরী হবার কথা ভাবেন তখন শ্রীরাধার অভিসারিকা চিত্রপট পাঠকচিত্তে প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে।

উপন্যাসের শেষ পরিচ্ছেদে হীরার উন্মাদ রোগ ভয়ংকর ও জটিলতর হলে, হীরার হৃদয়ের তুমুল কোলাহলকে অতিক্রম করে অতৃপ্ত প্রেমপিপাসা ও অভিমানকে দমন করতে একটি পূর্ব সুখ স্মৃতিতে জয়দেবের 'স্মরগরলখণ্ডনং শ্লোকের মধ্য দিয়ে মানিনী রাধার মান ভঞ্জনের দিকটিকে স্পষ্ট করা হয়েছে—

''স্মরগরলখণ্ডানং মম শিরসি মন্ডনং/দেহি পদপল্লবমুদারং।।''[২৪]

'বিষবৃক্ষ'-এর শেষ উক্তির মধ্য দিয়ে এক অভাবনীয় বৈষ্ণবীয় ভাববিন্দু পাঠক চিত্তের হৃদয়কে অপরূপ ভাষ্যে বিদীর্ণ করেছে, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দম্'-এর দশম সর্গের নবম পদ এটি। এর অর্থ শ্রীরাধার গরল নাশকারী চরণপদ্ম শ্রীকৃষ্ণ তার মস্তকে দিতে বলেছেন, যাতে তার দেহমনের বিরহঅগ্নি শীতল হয়।

উপন্যাসের সৌন্দর্য বর্ণনায় এই বৈষ্ণবীয় প্রেক্ষাপট অনেকাংশেই রচনাকে সার্থক রসসিক্ত করেছে। জয়দেবের পদ প্রকৃতপক্ষে শ্রীমতি রাধার মধুর রস বর্ণনা করেছে। রাধার উদ্দেশ্যে কৃষ্ণের আশ্বাস, সমবেদনা, উপদেশ, আর্তি, প্রগাঢ় রূপে যেভাবে উচ্ছ্বসিত হয়েছে, ঠিক তেমনি ছদ্মবেশী হরিদাসী বৈষ্ণবী রূপী দেবেন্দ্র কুন্দনন্দিনীকে পাবার আশায় নানা উপায়ে সেই প্রেমার্তিকেই উন্মুক্ত করেছে। জয়দেবের মত বৈষ্ণব কবি তাঁর পদাবলীতে রাধাকৃষ্ণের বসন্ত রাসকে দ্বাদশ সর্গে বিভিন্ন পরিমণ্ডলে দেখিয়েছেন। আলোচ্য উপন্যাসে জয়দেব কৃত যে পদটির উল্লেখ আছে এর মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণ তার বিরহী হৃদয়কে মানিনী রাধার কাছে অর্পণ করতে ব্যবহৃত করেছিলেন। 'গীতগোবিন্দম্'-এ জয়দেব সুললিত পরিমার্জিত এবং শ্রুতিমধুর শব্দ সংযোজনার মধ্য দিয়ে মানবপ্রেমকে অভাবনীয় দৈবী শৃঙ্গার রসে পর্যবসিত করেছেন। এ প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল— জয়দেব এখানে রাধাকৃষ্ণের প্রেমাঙ্কনে রাধাকে একান্তই সংসারের কুলবধূরূপে উপস্থাপনা করেছেন। মিলনান্তক প্রেমকাব্যে তিনি নায়ক নায়িকার রতিবিলাস ও বিলাসান্তে একটি মধুর মিলনকে দৃশ্যায়িত করলেও কামনা বাসনার ভক্তিরূপকেই সেখানে গুরুত্ব দিয়েছেন। পদাবলী সাহিত্যের ভক্তিসাধনার এক প্রবহমান উৎসমূলক কাব্য হল জয়দেবের এই 'গীতগোবিন্দম্'। চৈতন্যদেবের জীবনকেন্দ্রিক ভাবনার বীজমন্ত্র প্রাচীনযুগেই এই মহান কবি জয়দেবের সাহিত্য কীর্তির মধ্য দিয়ে সূত্রপাত হয়।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কথাসাহিত্যে নায়িকা তথা উপন্যাসের এক গুরুত্বপূর্ণ নারী চরিত্রের রূপ

বর্ণনায় তার প্রসঙ্গ উত্থাপনে জয়দেবের ভাষাগত রীতির যেমন অনুসরণ করেছেন, তেমনি এই উপন্যাসের নাম পরিচ্ছেদে হরিদাসী বৈষ্ণবীর একটি সংলাপ ব্যবহৃত হয়েছে—

''ব্রজের সুখ রাই দিয়ে জল/বিকাইনু পদতলে,
এমন চরণ নূপুর বেঁধে গেল গলে,
পশিব যমুনা জলে।''[২৫]

এই উক্তি জয়দেবের 'স্মরগরলখণ্ডনং' শ্লোককেই মনে করিয়ে দেয়। জয়দেবের পদ যেন পদাবলির আদিগঙ্গার হরিদ্বার সম। তাই কেবল মধ্যযুগেই নয়, আধুনিক যুগেও মধুসূদন থেকে রবীন্দ্রনাথ প্রায় সকলেই আদি পদাবলীকার জয়দেবকে তাঁদের আধুনিক কথাসাহিত্যের বহু অনুষঙ্গে সাগ্রহে স্বীকৃতি জানিয়েছেন। সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্যের সেতুবন্ধনকারী কবি জয়দেব প্রাকৃত ছন্দ স্পন্দনে, অলৌকিক দেবকাহিনীর রোমান্টিক মানবিক প্রণয় রূপকে যে সূক্ষ্মতার সঙ্গে সঞ্চারিত করেছিলেন, তা পরবর্তীকালে বহু দৈবী মহিমা কেন্দ্রিক কাব্যবিষয় ও চরিত্রকে মানবিকত্বে প্রকাশ করে, আধুনিকযুগে লেখক বঙ্কিমের উপন্যাসকেও প্রভাবিত করেছে। দেবেন্দ্র ছদ্মবেশে আলোচ্য উপন্যাসে বৈষ্ণবীয় প্রেমতাত্ত্বিক প্রসঙ্গের মধ্য দিয়ে নায়িকা কুন্দনন্দিনীর হৃদয়ে স্থায়ী ভাবে স্থান অর্জন করতে চেয়ে যেভাবে ব্যর্থ হয়ে হীরার কাছে আত্মসমর্পণ করতে চেয়েছেন, হীরার মান ভাঙাতে চেয়েছেন, উন্মাদিনী হীরা জীবনকে পুনরায় স্বাভাবিক করতে, মৃত্যুপথযাত্রী হয়েও পরিশেষে জীবনের তাগিদে মর্ত্য পৃথিবীতে শত বাঁধাবিপত্তির পরও ঘর বাঁধতে চেয়েছেন। এটাই প্রকৃত মানবিক ধর্ম। নরনারীর চিরন্তন শাশ্বত আত্মার মিলনবাণীই ঔপন্যাসিক পরিসমাপ্তিতে পাঠকের কাছে উন্মুক্ত করেছেন। দেবেন্দ্রর নাগর সুলভ প্রগলভ চাতুর্য হীরার মত নারীকে প্রলোভিত করে, তাকে উন্মাদিনী করে মৃত্যুর দিকে অবহেলায় যতটা স্বাভাবিক ভাবে ঠেলে দিতে পেরেছিল, জীবনের অন্তিম দিনে নিজের ভুল অনুধাবন করে সেই হীরাকেই পরম স্নেহে প্রেমপাত্র তুলে দিতে চেয়েছেন, বৈষ্ণবীয় 'প্রেমতত্ত্ব'-এর পরিমণ্ডলে জয়দেবের 'গীতগোবিন্দম্'-এর প্রথিতযশা কাব্যোক্তির মধ্য দিয়ে। বিষবৃক্ষের ফলেই তিনি ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে অন্তিম নিঃশ্বাস কালে শাশ্বত দেহাতীত প্রেমের কাছে জীবন উৎসর্গ করে গেছেন একথা বললে অত্যুক্তি হয় না।

ইন্দিরা (১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দ) :

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ ১২৭৯ বঙ্গাব্দে বৈশাখ মাসে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'ইন্দিরা' উপন্যাসটি প্রকাশিত করেন। উপন্যাসটি আয়তনে স্বল্পতার কারণে একে বড় গল্প রূপে সমালোচকরা চিহ্নিত করেছেন। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ১৭৭ পৃষ্ঠার একটি অনু উপন্যাসের

পঞ্চম সংস্করণ আত্মপ্রকাশ করে। নায়ক নায়িকার আত্মভাষণে উপন্যাসের কাহিনী ব্যক্ত হয়েছে। উপন্যাসটির উল্লেখযোগ্য চরিত্র হল ইন্দিরা, সুভাসিনী, উপেনবাবু এবং রমেনবাবু। ইন্দিরা আত্মকথন রীতিতেই উপন্যাসকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। স্বামীগৃহে যাত্রাকালে পথমধ্যে তার অলংকারাদি ডাকাতি হলেও বিশেষ কিছু ক্ষতি হয়নি। কিন্তু কিশোরী এবং বাস্তব জগৎ সম্পর্কে অনভিজ্ঞ হওয়ার কারণে ধনীর দুলালি ইন্দিরাকে কলকাতার এক ধনী পরিবারে খোরাক, পোশাক সহ মাসিক তিন টাকা মাইনের পাচিকা রূপে নিযুক্ত করা হলে, সেখানেই ঘটনাচক্রে তার স্বামী উপেনবাবুর সঙ্গে তার চারিচক্ষের মিলন হয়, ঘটনাচক্রে উপেনবাবুর সঙ্গে ইন্দিরা কলকাতায় এসে তারই তত্ত্বাবধানে থেকে কুসংস্কার মূলক মানসিকতার পরিচয় রূপে 'বিদ্যাধরী' হিসেবে চিহ্নিত হন। উপন্যাসটি সম্পূর্ণ ইন্দিরার জবানিতে কথিত হয়েছে। এই উপন্যাসে নারী মনস্তত্ত্বের উন্মোচনে বঙ্কিমচন্দ্র অনেকদূর অগ্রসর হতে পেরেছেন। এ প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো উপেনের মত পুরুষ কুসংস্কারাচ্ছন্ন হওয়ার কারণে ইন্দিরাও তাকে ডাকিনী যোগিনী, বিদ্যাধরী কেন্দ্রিক বিষয়ে কিঞ্চিত হলেও ব্যবহার করেছেন। আমাদের অন্বিষ্ট বিষয় 'ইন্দিরা' উপন্যাসে বৈষ্ণবীয় অনুষঙ্গের অনুসন্ধান।

উপন্যাসের পঞ্চম পরিচ্ছেদে 'বাজিয়ে যাব মল' শীর্ষক অংশে ইন্দিরাকে যখন কলকাতায় নিয়ে আসা হয়, তখন গঙ্গানদী দেখে তার হৃদয়ে প্রফুল্ল প্রশান্তির বার্তা বয়ে যায়, কলকাতায় আসার পূর্বদিনে একটি গ্রামে জেলেদের মাছ ধরা, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের নদীর ঘাটে বসে শাস্ত্রপাঠ প্রভৃতি দৃশ্যের মধ্যে একটি দৃশ্য তার মনের মণিকোঠায় বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করে। আর এখানকার বর্ণনা ও ইন্দিরার উক্তিতে বৈষ্ণব ভাবনার প্রতিচ্ছবি আত্মপ্রকাশ করে। সুন্দরীদের বেশভূষা পরে নদীর ঘাটে জল আনতে যাওয়া, কেউ কলসী পুরে জল নেয়, কেউ ঢালে, নারীদের জলকেলি তাদের রহস্যাবৃত হাস্যধ্বনি, গল্পকথা, মধ্যযুগীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে রাধা সহ সখীগণের প্রতিচ্ছবিকেই স্মরণ করায়। উপন্যাসে এই দৃশ্যটির সঙ্গে ইন্দিরার সাধারণীকরণ ঘটে, তার চিত্তে একটি প্রাচীন প্রেমময় গীত গুঞ্জরিত হয়েছে—

''একা কাঁকে কুম্ভ করি কলসীত জল ভরি,
জলের ভিতরে শ্যামরায়!
কলসীতে দিতে ঢেউ আর না দেখিলাম কেউ,
পুন কানু জলেতে লুকায়।।''[২৬]

এই গীতে স্পষ্টতই শ্রীরাধার প্রেমিক শ্রীকৃষ্ণের প্রতিবিম্ব দর্শনের কথা বলা হয়েছে। যা

প্রেমিকা শ্রীরাধাকে প্রাত্যহিক কর্মে সদাব্যস্ত করে রাখত। ঠিক সেই অনুরূপ ভাবনাই ইন্দিরার মনে তার স্বামীর প্রতি বা প্রেম পুরুষের প্রতি অনুভূত হয়েছে জলক্রীড়া রত রমণীদের লক্ষ্য করে। শ্রীরাধার পূর্বরাগ অনুরাগের একটি আবহ স্বল্প পরিসরে উপন্যাসে উঠে এসেছে। অর্থাৎ নায়ক নায়িকা মিলনের পূর্বে দর্শনের যে আকাঙ্ক্ষা তার পরিপূর্ণ প্রেমাবেগই হল পূর্বরাগ, যা নায়িকাকে নায়কের প্রতি তার চিত্ত চাঞ্চল্য ও সম্পর্ককে স্থিরীকৃত করতে সহায়তা করে। ঠিক এই একই অনুভবে ইন্দিরাও উপন্যাসে রাধা অনুরূপিনী মানসিকতার পরিচয়ে নিজেকে উন্মুক্ত করেছেন।

সিপাহী বিদ্রোহের পূর্ববর্তী কলকাতা, ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী এই সময়ে রচিত উপন্যাসে ইন্দিরা তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগত দিকের প্রায় প্রতিপর্বেই প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, সর্বোপরি তার পরিহাস ও কৌতুকরস সমৃদ্ধ স্বভাব উপন্যাসে অন্যমাত্রা যুক্ত করে। উপন্যাসে কামিনী যিনি ইন্দিরার থেকে বছর দুয়েকের ছোট তিনি ইন্দিরার সঙ্গে কথোপকথন কালে উচ্চারিত করেন—

> ‘‘ধবলী বলিল শ্যাম, কে চেনে তোমারে!
> চিনি শুধু কাঁচা ঘাস যমুনার ধারে।।
> পদচিহ্ন খুঁজি তব, বংশী শুনে কানে।
> ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ তায়, গোরু কি তা জানে?’’[২৭]

কামিনী ইন্দিরাকে এই প্রসঙ্গ নিতান্ত সহচরী রূপে তার মনোভাবকে জানার জন্যই রসিকতার ছলে উপস্থাপন করেছেন। শ্যাম, যমুনার ধার, বংশীধ্বনি, এই সকল অনুষঙ্গগুলি বৈষ্ণব পদ আশ্রিত হয়েই আধুনিক উপন্যাসে নরনারীর প্রেমকে সুচিহ্নিত করতেই উপমা স্বরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। কৃষ্ণের ধ্বনি যেরূপে রাধাকে উন্মত্ত করেছে, প্রিয় বিহনে ইন্দিরার মনের বাসনাকে বোঝাতে কামিনীর উক্ত উক্তিটি একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। বৈষ্ণবপদের আবর্তে সহজ সরল এক প্রসন্নতা ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসের নাম চরিত্র ইন্দিরার মধ্যে স্বল্প বৈষ্ণবীয় প্রেমতাত্ত্বিক বাতাবরণে সুচারু ভাবেই অঙ্কন করেছেন একথা বললে অত্যুক্তি হয় না।

চন্দ্রশেখর (১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দ) :

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠতম উপন্যাসগুলির মধ্যে অন্যতম হল ‘চন্দ্রশেখর’। পারিবারিক জীবন আঙিনায় বৃহত্তর রাজনৈতিক ইতিহাসকে সম্মিলিত করেই বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসটি রচনা করেছিলেন। রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে ব্যক্তিগত জীবনের শান্তি বিঘ্নিত করে এক প্রকার জাতীয় ভাগ্য-পরিবর্তনকে যেভাবে ইঙ্গিতায়িত করা হয়েছে, উপন্যাসের পটচিত্রে তারই প্রত্যক্ষ

প্রকাশ লক্ষিত হয়। সময়গত দিক থেকে মুসলিম রাজত্বের অবসান ও ইংরেজ শাসনের সূচনাকালীন লগ্নে 'চন্দ্রশেখর' -এর মত এক যুগ পরিবর্তনকারী উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে উপহার দেন ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র। একদিকে নব্য শাসনাধীন ইংরেজ শাসকের দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, দুঃসাহসিকতা ও সর্বপ্রকার নৈতিক সংকোচহীন চিত্রের পাশাপাশি দেশবাসীর প্রতি তাদের মনোবৃত্তি, বিচিত্র এক সম্পর্কে রোমান্টিক আখ্যান এই কাহিনীর বিষয়ীভূত হয়েছে। ১৮৭৫ সালের জুন মাসে 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসটি প্রকাশিত হলেও ১২৮০ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাস থেকে ১২৮২-র ভাদ্র সংখ্যা পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে 'বঙ্গদর্শন'-এ প্রকাশিত হয়। উপন্যাসের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে রামানন্দস্বামী, চন্দ্রশেখর, প্রতাপ এবং রামচরণের মত চরিত্ররা সজীব হয়ে উঠেছে। মীরকাশিম ও ইংরেজ সংঘর্ষের মধ্যেও সামাজিক পটভূমিতে প্রতাপ ও শৈবলিনীর প্রেমে বৈষ্ণবতত্ত্ব দর্শনের বেশ খানিকটা প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়েছে। দেশের এক গুরুত্বপূর্ণ সময়ে দাঁড়িয়েও ঔপন্যাসিক রোমান্সকে কোন অংশে অবহেলা করেননি। স্বাভাবিক মানবিক প্রবৃত্তি থেকেই ঔপন্যাসিকের লেখন শৈলীতে যা সহজভাবেই উঠে এসেছে।

উপন্যাসের কাহিনী সংক্ষেপে বিবৃত করলে জানা যায় সমগ্র উপন্যাসটি একটি ত্রিকোণ সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল। এই ত্রিকোণ প্রেমে প্রতাপ, শৈবলিনী ও চন্দ্রশেখর বিরাজমান। উপন্যাসের প্রথমেই প্রতাপ ও শৈবলিনীর মধ্যে একটি বাল্যপ্রণয়ের সম্পর্ক প্রদর্শিত হয়েছে, যারা আত্মীয় হওয়ার কারণে, সামাজিক বিধিনিষেধ থাকায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে না পারার আত্মযন্ত্রণায় গঙ্গায় আত্মহত্যা করতে যাওয়ার পর, প্রতাপ যখন প্রায় অর্ধনিমজ্জিত তখন শৈবলিনীর আত্মচৈতন্য লাভ হয়, সে প্রতাপকে ফেলেই গ্রামে চলে আসে। ঘটনাচক্রে চন্দ্রশেখর প্রতাপের প্রাণ রক্ষা করে। চন্দ্রশেখরের সঙ্গে শৈবলিনীর বিবাহ হয় ও বিবাহের আট বছর পর উপন্যাসের মূল কথাবস্তুর সূত্রপাত ঘটে। এদিকে শিক্ষাগত যোগ্যতায় শৈবলিনী চন্দ্রশেখরের সমগোত্রীয় নয়, ইতিমধ্যে তাদের দাম্পত্য জীবনে নানা অসামঞ্জস্য ও প্রীতিসুখের অভাব জনক পরিস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। নানা ঘটনা চক্রে উপন্যাসে তাই মূল চালিকা শক্তি রূপে শৈবলিনীকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই দ্বান্দ্বিক প্রেক্ষাপটে সখী সুন্দরীর সঙ্গে এক সোনালী বিকেলে বিশেষ মুহূর্তে অতিবাহিত করার সময় শৈবলিনী মনের আনন্দে একটি গান গুনগুনিয়ে গাইতে থাকে—

> ''ঘরে যাব না লো সই
> আমার মদনমোহন আসচে ওই।
> হায়! যাব না লো সই!''[২৮]

শৈবলিনীর এই উক্তি শ্রীরাধার বয়সসন্ধিকালীন পদকেই স্মরণ করায়। শ্রীরাধা মদনমোহন কৃষ্ণের অপেক্ষায় গৃহে ফিরতে চান না। আবার কখনো তার সখীর অনুরোধে মদনমোহনের অপেক্ষা উপেক্ষা করার সাহস রাখেন। সেইরূপ জগৎঐশ্বর্য ত্যাগী শ্রীমতী রাধার প্রতিচ্ছবি আমরা উক্তিটিতে শৈবালিনীর মধ্যে দেখতে পেয়েছি। বঙ্গিমচন্দ্র নারী স্বাধীনতা ও জীবন উপভোগের কাঙ্খিত, অবদমিত বাসনা থেকেই এই প্রকার দুঃসাহসিকতা দেখাতে পেরেছেন। জীবনের প্রতি টান এবং সকল প্রকার শূন্যতাই চরিত্রটিতে অন্যমাত্রা সংযোজিত করেছে। বিবাহিত জীবনে দাম্পত্য সুখের অভাব এবং প্রতাপের প্রতি অবিচ্ছেদ্য টান বিবাহিত শ্রীরাধার অসুখী দাম্পত্য জীবন ও কৃষ্ণের প্রতি অপর্যাপ্ত প্রেমের বাসনাকেই বঙ্কিমচন্দ্র প্রচ্ছন্নে শৈবলিনীর মধ্য দিয়ে উপন্যাসে দেখাতে চেয়েছেন।

ঠিক একই রকমভাবে শৈবলিনী যখন ইংরেজ সাহেব লরেন্স ফষ্টরের সংস্পর্শে আসেন, এরপর সখী সুন্দরী তার থেকে সামান্য দূরত্ব বজায় রেখে চললেও সর্বদাই শৈবলিনীর কাতর মনোবেদনার সাক্ষী থেকেছেন। শৈবলিনীর গীতের সময় শ্রীরাধার ন্যায় বিরহ দহনে তপ্ত হয়েছেন ঠিক এভাবে—

> ‘‘আমার মরম কথা তাই লো তাই।
> আমার শ্যামের বামে কই সে রাই।।
> আমার মেঘের কোলে কই সে চাঁদ।
> মিছে লো পেতেছি পিরীতি ফাঁদ।।’’[২৯]

এ যেন স্পষ্টভাবে শ্যামের অদর্শনে তাকে প্রকৃত অর্থে না পাওয়ার বেদনায় কাতর রাধার দীর্ঘ প্রতীক্ষাবাণীর অনুরণন। তার হৃদয়ের গহনতলে সে কেবল প্রাণকৃষ্ণের সন্ধান করেছে, প্রিয়কে আবদ্ধ করার মিছে ফাঁদই এতকাল পেতেছে। কিন্তু প্রিয় মানুষটিকে প্রকৃত অর্থে পাননি। সেই একই ভাবনা শৈবলিনীর মনেও তার অতৃপ্ত প্রেম বহ্নিকে বিবাহিত হবার পরও সখী সুন্দরীর সম্মুখে উন্মুক্ত করতে হয়েছে। প্রেমপাত্রের জন্য তার এই উন্মত্ততাকে উন্মাদিনী রাধার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে উপন্যাসের একটি উক্তি—

‘‘সুন্দরী তখন বুঝিল। কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিল। সুন্দরীর চক্ষু প্রথমে চকচকে হইল, তারপরে পাতার কোলে ভিজা ভিজা হইয়া উঠিল, শেষে জলবিন্দু ঝরিল— সুন্দরী কাঁদিতে লাগিল। স্ত্রীজাতিই সংসারের রত্ন! এই সুন্দরী আর এক দিন কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিয়াছিল, শৈবলিনী যেন নৌকা সহিত জলমগ্ন হইয়া মরে। আজি সুন্দরীর ন্যায় শৈবলিনীর জন্য কেহ কাতর নহে।’’[৩০]

একটি সাধারণ বাক্যে ঔপন্যাসিক নায়িকার পাশে সুন্দরীর মত সহচরীকে এই মনোভাবে প্রতিষ্ঠা করে বৈষ্ণবদর্শনের রাধা ও সখীর চিত্রকে তুলে ধরেছেন। এ প্রকার উক্তি সখী সম্বন্ধের ঐকান্তিক নিগূঢ় তত্ত্বমূলক দিককে প্রকাশিত করেছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুষঙ্গে। বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসে রোমান্সকে মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে বিচার করেছেন। বিশেষত নারী মনস্তত্ত্বের বিচারে নীতিবাদী বঙ্কিম উপন্যাসে প্রেম সম্পর্কের বহুকৌণিক দিককে প্রস্তুত করলেও মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় রূপে শৈবলিনীর অন্তরে প্রবেশ করতে চেয়েছেন। প্রথম যৌবনে প্রতাপের সঙ্গে তার আত্মিক অপরিণত প্রেম সম্পর্কের অপরিপূর্ণতা, বিবাহিত জীবনে চন্দ্রশেখরের মত বিদ্বান মানুষের সান্নিধ্যেও অসুখী অব্যক্ত দাম্পত্য যন্ত্রণা, এরই মধ্যে ইংরেজ লরেন্স ফষ্টরের সমাজ ও গার্হস্থ্যজীবন থেকে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা, সংসার জীবনে ফিরে আসার ভয়, পরিশেষে সকল প্রকার অন্তর্দ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে নিজ হৃদয়ের বাণীকে গুরুত্ব দিয়ে উপন্যাসে শ্রীরাধার ছায়াময়ী শৈবলিনী চরিত্রে এক প্রকারের আত্মকেন্দ্রিকতার পাশাপাশি, আত্মবিশ্বাস ও দুঃসাহসিক পটচিত্র প্রস্ফুটিত হয়েছে। মৃণালিনীর মধ্যে যে জটিল রহস্যময়তা আবৃত ছিল, শৈবলিনীর মধ্যে সেই রহস্যময়তার ঊর্ধ্বে বাস্তব জীবনকেন্দ্রিক ভাবনাই মুখ্য হয়ে উঠেছে। এখানেই নীতিবাদী বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র জয়ী হয়েছেন। শৈবলিনীর প্রেমের প্রতি তাঁর যে সহানুভূতিপূর্ণ মমত্ব, বলিষ্ঠতা সংসার বিমুখ হয়েও প্রবল স্নেহাকাঙ্ক্ষার সুতীব্র বাসনায় বারবার জীবন সমুদ্রে অবগাহন করা, এই মনোভাবই মধ্যযুগীয় কালপর্বে রচিত বৈষ্ণব পদাবলীর নায়িকা শ্রীমতী রাধার জীবন লীলার সমার্থক হয়ে উপন্যাসে যুক্ত হয়েছে মধ্য ও আধুনিক এই দুই যুগের এক অভিনব নারী মনস্তত্ত্ব। বৈষ্ণবীয় 'প্রেমতত্ত্ব' ও 'সখীতত্ত্ব' খানিক 'স্বকীয়া-পরকীয়া তত্ত্ব'-এর আভাসে উপন্যাসটি বহুলাংশে সমৃদ্ধ হয়েছে।

রাজসিংহ (১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ) :

'রাজসিংহ' উপন্যাসের প্রথম প্রকাশ 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় চৈত্র, ১২৮৪ বঙ্গাব্দ থেকে ভাদ্র, ১২৮৫ বঙ্গাব্দে। বড় গল্পরূপে এবং অসমাপ্ত আকারে। পত্রিকার অসমাপ্ত উপন্যাসটি সমাপ্ত করেন ১৮৮২ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি। ৮৩ পৃষ্ঠার প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় সংস্করণের পৃষ্ঠা বেড়ে হয় ৯০। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে চতুর্থ সংস্করণে পৃষ্ঠা সংখ্যা বেড়ে হয় ৪৩৪। লেখক স্বয়ং এই উপন্যাসের ভূমিকায় লিখেছেন— এই প্রথম তিনি ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখলেন। মোঘল রাজপুত বিরোধের প্রেক্ষাপটে রচিত। এই উপন্যাসের উল্লেখযোগ্য চরিত্রগুলি হল— চঞ্চলকুমারী, রাজসিংহ, মানিকলাল, জেবউন্নিসা, মোবারক, দরিয়াবিবি।

'রাজসিংহ' (১৮৮২) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচিত প্রথম সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস। ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রকৃত আদর্শকে তিনি এই উপন্যাসে দেখিয়েছেন। মূলত রাজপুত অর্থাৎ হিন্দুদের বাহুবল বৃদ্ধির বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে তিনি মোঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে রাজপুত রাজসিংহের যুদ্ধ, তাদের অন্তর্দ্বন্দ্বকে উপন্যাসের বিষয় রূপে তুলে ধরেছেন। এই যুদ্ধের কাহিনীর পাশাপাশি উপন্যাসে স্থান পেয়েছে মোবারক ও জেবউন্নিসার কাল্পনিক প্রণয়কাহিনী। দরিয়াবিবি যে প্রেমকাহিনীকে গতিময়তা দান করেছে। উপন্যাসের কাহিনী বিশ্লেষণের অভ্যন্তরে পদার্পণ করা তেমন গুরুত্বপূর্ণ না হলেও, বিশেষ চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে বৈষ্ণবধর্মী প্রেক্ষাপট খুব সামান্য হলেও উপন্যাসের মধ্য থেকে উচ্ছলিত হয়েছে, যা প্রেমকেন্দ্রিক মহিমাকে উন্মোচিত করতে ঐতিহাসিক যুদ্ধাত্মক ঔপন্যাসিক কাহিনীকে একটু ভিন্ন মাত্রা দিয়েছে।

এ প্রসঙ্গে বলা যায় উপন্যাসের 'চতুর্থ খণ্ড রন্ধ্রেযুদ্ধ, প্রথম পরিচ্ছেদ : চঞ্চলের বিদায়' অংশে রাজকুমারী চঞ্চলকুমারী মোগল সৈন্যের সঙ্গে দোলারোহনে চলার সময় তার সম্মুখে অশ্বারোহীগণ প্রভাতের প্রফুল্ল বায়ুতে গমন করছিল। তাদের মধ্যে একজন অগ্রবর্তী অশ্বারোহী মানিকলালের গানে উচ্চারিত হয়—

''শরম্ ভরম্‌সে পিয়ারী,
সোমরত বংশীধারী,
ঝুরত লোচনসে বারি!
ন সম্‌ঝে গোপকুমারী,
যেহিন্ বৈঠত মুরারি,
বিহারত রাহ তুমারি।''[৩১]

রাজকুমারী চঞ্চলকুমারীর কর্ণে এই গীত প্রবেশ করে তাকে তার প্রণয়ী রাজসিংহের কথাই স্মরণ করিয়েছে। সংগীতে বলা হয়েছে বংশীধারী কৃষ্ণের প্রতীক্ষায় সকল 'গোপকুমারী' অর্থাৎ সখীদের চোখে যে প্রেমবিরহ জাত অশ্রু তা কৃষ্ণপ্রেমের এক অপার মহিমাময় চিত্রকেই তুলে ধরেছে নিঃসন্দেহে এই উক্তির মধ্যে পদাবলীর বিরহজাত প্রতিচ্ছবি স্বল্প পরিসরে আভাসিত হয়েছে। ঠিক তেমনি সেই একই প্রেমপ্রবাহ বঙ্কিমচন্দ্রের নায়িকা রাজকুমারী চঞ্চলকুমারীর মনে তার প্রণয়ীর বিরহে অনুভূত হয়েছে। সে যেন সংগীতের মধুর সুর শ্রবণে নিজেকে সেই গোপীশ্রেষ্ঠা রাধা রূপে প্রতিষ্ঠিত করে কৃষ্ণসম রাজসিংহকে দর্শনের প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠিত হয়েছে। এ আস্থা ঠিক যেন চণ্ডীদাসের রাধার পূর্বরাগের শ্যামনাম শ্রবণের মুহূর্তকে মনে করিয়েছে। প্রেমের মধুর

প্রভাতী সুর, শ্যামনামে রাধার চিত্ত যেভাবে আকুলিত, তা তার কর্ণে প্রবেশ করা মাত্র হৃদয়ে এক ভিন্ন স্পন্দনকে যুক্ত করেছে, যা একদিকে রাধার পূর্বরাগ অন্যদিকে বিরহ ও আত্মনিবেদনের পটভূমিকাকে উন্মুক্ত করেছে। এই আবেগজাত শিহরণ জাগ্রত হয়েছে অশ্বারোহী মানিকলালের কণ্ঠে গীত শ্রবণের মধ্য দিয়ে, চঞ্চলকুমারীর হৃদয় রাজসিংহের স্মৃতিকে প্রজ্জ্বলিত করেছে। রাজসিংহের দর্শনের প্রতীক্ষায় সমভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এই মানবপ্রীতিই উপন্যাসের একটি ছোট অংশে বৈষ্ণবীয় প্রেমময় ভাবাদর্শে বঙ্কিমচন্দ্র উল্লেখ করে ঐতিহাসিক কাহিনীতে সংযুক্ত করেছেন এক ভিন্নতর মাত্রা। যেখানে বিরহের সুতীব্র দাবদাহের মধ্যে নরনারীর আত্মনিবেদনের বাণীই উচ্চারিত হয়েছে।

ইতিহাস ও রোমান্সের মিলিত আলেখ্যে চঞ্চলকুমারীর প্রেমে তাই নবনব বর্ণালীর ছটা বিচ্ছুরিত হয়েছে। একদিকে ঐতিহাসিক উপন্যাসের নায়িকা রূপে যেমন তার মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমনি শিল্পের প্রয়োজনে তিনি মধ্যযুগের পদসাহিত্যের অঙ্গন প্রদক্ষিণ করে আধুনিক যুগের প্রেমময় বহু বৈশিষ্ট্যের দীপ্তি ছড়িয়েছেন, এ কথা বললে অত্যুক্তি হয় না। হিন্দুর পরাক্রমী ছবির পাশাপাশি, নারী হৃদয়ের স্বাভাবিক প্রেম প্রবৃত্তিও উপন্যাসে ভিন্নমাত্রা সংযোজন করেছে। তাইতো মানিকলালের এই গান চঞ্চলকুমারীর হৃদয়ে উত্থিত প্রেমবহ্নির প্রশান্তি স্বরূপ এক অবিশ্বাস্য স্বাতন্ত্র্য ও আশ্বাসবাণী রূপে গীত হয়েছে, এ কথা স্পষ্ট ভাবেই বলা যায়। ঐতিহাসিক পটভূমিতে রচিত উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে নরনারীর জীবনায়ন ও বিস্তৃত যুগোপযোগী ইতিহাসকে স্বল্প পরিসরে বৈষ্ণবীয় প্রেমতাত্ত্বিক বিরহ দহন কেন্দ্রিক পরিমণ্ডলে যে প্রাণসত্তা দান করেছেন, এখানেই ঔপন্যাসিক হিসেবে তাঁর কৃতিত্ব। নায়ক নায়িকার অভিনব মিলনের মধ্য দিয়েই প্রস্ফুটিত হয়েছে, একথা স্পষ্টভাবে বলা যায়। খানিক ঝলকে বৈষ্ণবীয় অনুষঙ্গ ও ভাবাদর্শগত সাদৃশ্য কাহিনীতে ভিন্নমাত্রা সংযোজন করেছে একথা অনস্বীকার্য।

আনন্দমঠ (১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ) :

স্বদেশপ্রেমের প্রজ্জ্বলিত বহ্নিতে উদীয়মান এক অমর সৃষ্টি হল 'আনন্দমঠ'। উপন্যাসটি ১৮৮২ সালের ১৫ই ডিসেম্বর (১২৮৯) গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে ১২৮৭ বঙ্গাব্দের চৈত্র থেকে ১২৮৯ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের (১১৭৬ বঙ্গাব্দ/১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দ) পটভূমিকায় উপন্যাসটি রচিত হয়েছে বলে ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের অনুজ পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অভিমত পোষণ করেছিলেন। উপন্যাসে এক আদর্শবাদ কাহিনীর প্রতিটি স্তরে সঞ্চারিত হয়েছে। 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের মূল মন্ত্রই হল

দেশাত্ববোধ। উত্তরবঙ্গের সন্ন্যাসী বিদ্রোহের কাল্পনিক গৌরবময় দিককে তিনি উপন্যাসের দেশাত্মবোধক মহাকাব্যিক ব্যাখ্যা রূপে উপস্থাপন করেছেন। মুঘল শাসনের অবসান ও ইংরেজ শাসনের উত্থানকালীন সময়ে রচিত হলেও ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ প্রতিধ্বনিই উপন্যাসে অধিক মাত্রায় প্রাধান্য পেয়েছে। স্বদেশপ্রেম ও স্বদেশপ্রেমীদের আত্মোৎসর্গের উদ্দীপনা, 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি, আত্মত্যাগ, আদর্শবাদের দিক থেকে উপন্যাসে একটি ক্রান্তিকারী ঐতিহাসিক পর্ব ও কাহিনীগ্রন্থনে অসীম নৈপুণ্য লক্ষিত হয়। জ্যোতির্ময় স্বদেশপ্রেম ও বলিষ্ঠ আত্মত্যাগের সমন্বয়ে রচিত উপন্যাসে বৈষ্ণবীয় প্রতিচ্ছবি বা সংলাপ আভ্যন্তরীণ বৃত্তে প্রতিবিম্বিত হতে দেখা যায়।

কাহিনী সংক্ষেপে প্রথমেই জানা যায় গ্রামের ধনবান জমিদার মহেন্দ্র সিংহ 'পদচিহ্ন' গ্রামে তাঁর স্ত্রী কল্যাণী ও কন্যা সুকুমারীর সঙ্গে বসবাস করেন। মন্বন্তরের সময় খাদ্যাভাবে, এক প্রবল সংকটময় মুহূর্তে তাদের বিচ্ছেদ হয় ও পথে একাকী কল্যাণী, সুকুমারীকে নিয়ে ডাকাতদের হাত থেকে রক্ষা পেতে জঙ্গলে নদীর ধারে পৌঁছে প্রায় সংজ্ঞাহীন অবস্থায় হিন্দু সন্ন্যাসী সত্যানন্দের সম্মুখীন হন এবং সত্যানন্দ মহেন্দ্রর কাছে তাদের পৌঁছানো পর্যন্ত নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করেন। এই সত্যানন্দের বহু সংলাপে কৃষ্ণনাম বা কৃষ্ণকথার স্রোতধারা প্রবাহিত হয়ে উপন্যাসে বৈষ্ণবীয় পরিমণ্ডল রচিত হয়েছে। সত্যানন্দের চরিত্র বা সংলাপে প্রবেশের পূর্বে তার স্থানকাল বিবেচনা করা বিশেষ বিচার্য। সত্যানন্দের সঙ্গে আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ হয় নিশীথকালে অরণ্য মধ্যে। তিনি উপাসনায় রত ছিলেন। তার চারিত্রিক বিশ্লেষণ পরবর্তী পর্যায়ে আলোচিত হবে। তবে মহেন্দ্রর সঙ্গে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকাকালীন কল্যাণী শ্রীকৃষ্ণ মধুসূদন রক্ষাকর্তাকে পরিত্রাণের হেতু বারবার স্মরণ করেন, সে প্রবল ভীত অবস্থায় সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন। বাহ্যজ্ঞানশূন্য চৈতন্যময় অবস্থায় কল্যাণী শুনতে পান—

> ''হরে মুরারে মধুকৈটভারে।
> গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দশৌরে।
> হরে মুরারে মধুকৈটভারে।''[৩২]

প্রবল অচৈতন্য অবস্থায় দিগ্বিদিক শূন্য হয়ে তার মনে হয় স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই বিপদ থেকে তাকে রক্ষা করতে মর্ত্যধামে নেমে এসেছেন। এ যেন ভক্তের আকূতিতে ভগবানের রক্ষাকর্তা রূপের আগমন। আর এই মনোবাঞ্ছাতেই গোপাল গোবিন্দকে স্মরণ করে তার সংজ্ঞা লুপ্ত হয়। পতিপ্রেমের প্রগাঢ়তা ও মধ্যযুগীয় কাব্যরূপে বৈষ্ণবীয় পদকেন্দ্রিক বা ঈশ্বর কেন্দ্রিক যে ভাবনা ও

ঈশ্বর ভক্তি এই দুটি বিষয়কে মিলিত করে বঙ্কিমচন্দ্র পূর্ণ রূপে গড়ে তুলেছেন। শ্রীকৃষ্ণের 'পরম-স্বরূপ তত্ত্ব'-এর প্রতিচ্ছবি যে তত্ত্বে শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দকে পূর্ণরূপে পূজনীয় ঈশ্বর জ্ঞান করা হয়েছে, যেখানে তিনিই সকল শক্তির আধার। এই ঈশ্বর ভক্তির পরাকাষ্ঠায় কল্যাণীর মত রমণীর চরিত্র পরিপূর্ণতা পেয়েছে। কল্যাণীর গোবিন্দ স্মরণের চিত্র একদিকে তার পতি মহেন্দ্রর সঙ্গে মিলিত হওয়ার বাসনা, অন্যদিকে ঈশ্বরের নিকট পতির প্রাণরক্ষার প্রার্থনা— এই দুই ভাবনায় কল্যাণীর মধ্যে প্রকৃত প্রেমময়ী নারীসত্তার উজ্জ্বল আভা বিকশিত হয়েছে।

উপন্যাসে মহেন্দ্রর সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী দলে যুক্ত হয়ে দেশসেবার আত্মবিসর্জন করার সংকল্পে কল্যাণীর পূর্ণ সমর্থন করা, নানা প্রতিকূলতার মধ্যে তাদের মিলন, বা সাক্ষাতের মধ্যে স্বদেশ প্রীতির যে সেবামূলক দিক প্রকাশিত হয়েছে এবং পতিব্রতা হয়েও যে স্বামীর মনোবাঞ্ছাকে প্রাধান্য দিয়ে তার থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে তাকে বিসর্জনের মধ্য দিয়ে যে প্রেমের মহত্ব দেখিয়েছেন, তা নিঃসন্দেহে আধুনিক নারী হিসেবে তার মর্যাদাকে অনেকাংশে বৃদ্ধি করেছে।

উপন্যাসের ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে কৃষ্ণ কল্লোলিনী নদীতীরে কল্যাণী উপস্থিত, এই অধ্যায়ে মহেন্দ্র ও সন্ন্যাসী সত্যানন্দের প্রথম সাক্ষাত হয়। ইতিমধ্যে ইংরেজ সৈন্য তাদের গ্রেপ্তার করলে সত্যানন্দ অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে সিপাহীদের কাছে হরিনাম সংকীর্তনের অনুমতি চাইলেন; সত্যানন্দকে তারা ভালো মনে করে গান গাইবার আদেশ দিলেন। ব্রহ্মচারী সত্যানন্দ গাইলেন—

''ধীরসমীরে তটিনীতীরে
বসতি বনে বরনারী।
মা কুরু ধনুর্দ্ধর, গমনবিলম্বন
অতিবিধুরা সুকুমারী।।''[৩৩]

এরই মধ্য দিয়ে তিনি কল্যাণী ও সুকুমারীকে উদ্ধারের নির্দেশ দেন তার সহকর্মী জীবানন্দকে। এই জীবানন্দের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে বলা যায়, তাকে ভালোবেসে বিবাহ করে শান্তি। শান্তি ছিল অনাথ, বিবাহের পর 'আনন্দমঠ'-এ যুক্ত হবার কারণে জীবানন্দ শান্তির সঙ্গে খুব বেশি দিন দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করতে পারেননি। কারণ দেশের উত্তাল পরিস্থিতিতে স্বদেশের সেবা করাই তার কাছে বড় মনে হয়েছে। এদিকে শান্তিও তাকে সমর্থন করেছেন। শান্তির মধ্যে আমরা এক রোমান্টিক নারীসত্তার চিত্রপটকে প্রকাশিত হতে দেখি নিম্নোক্ত গীতের মধ্য দিয়ে—

''এ যৌবন-জলতরঙ্গ রোধিবে কে?
হরে মুরারে! হরে মুরারে!

জলেতে তুফান হয়েছে,
আমার নূতন তরী ভাস্‌ল সুখে,
মাঝিতে হাল ধরেছে,
হরে মুরারে! হরে মুরারে!
ভেঙে বালির বাঁধ, পুরাই মনের সাধ,
জোয়ার গাঙে জল ছুটিছে রাখিবে কে?
হরে মুরারে! হরে মুরারে !"[৩৪]

শান্তির এই গীতের মধ্য দিয়ে জীবানন্দর প্রতি তার হৃদয়বহ্নির প্রজ্জ্বলিত শিখার ইঙ্গিত প্রকাশিত। প্রবল যৌবন জ্বালায়, জীবনের প্রেমময় তুফান সমুদ্রে হৃদয়মাঝি হাল ধরলেও ভালোবাসার প্রবল জোয়ারে তাকে তিনি কোনভাবেই রুদ্ধ করতে পারছেন না, এ পরিস্থিতিতে তিনি ত্রাণকর্তা হরিকে বারবার স্মরণ করেছেন। শান্তির দাম্পত্য জীবনের অতৃপ্ত বাসনার ঊর্ধ্বে সহধর্মিনী সহকারী রূপে তাকে সমর্থন করেছিল ঠিকই কিন্তু জীবানন্দর অদর্শনে তার চিত্তে প্রায়ই যে দাম্পত্য স্নেহের অভাবজনিত আকাঙ্ক্ষা আভাষিত হত, তা কৃষ্ণ স্মরণের প্রত্যক্ষ প্রতিচ্ছবিতে ঔপন্যাসিক স্পষ্ট স্মরণ করিয়েছেন। ঠিক একই ভাবনার আরো একটি প্রমাণ তৃতীয় খণ্ডের সপ্তম পরিচ্ছেদের প্রথমেই পরিলক্ষিত হয়েছে, জীবানন্দ কুটির থেকে চলে গেলে, শান্তিদেবী পুনরায় অন্তরবহ্নিকে শান্ত করতে সারঙ্গ নিয়ে মৃদু স্বরে সঙ্গীত করলেন—

''প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদম্
বিহিতবহিত্রচরিত্রখেদম
কেশব ধৃতমীনশরীর
জয় জগদীশ হরে।
... ...
নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতম্
সদয়-হৃদয়-দর্শিতপশুঘাতম্
কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর
জয় জগদীশ হরে।"[৩৫]

ভবানন্দ গোস্বামী বিরচিত এই সংগীত শান্তিদেবীর কণ্ঠ নিঃসৃত হয়ে, রাগ-তাল-লয়ে সম্পূর্ণ হয়ে, সেই অনন্ত কাননের অনন্ত নীরবতা বিদীর্ণ করে, পূর্ণ জলোচ্ছ্বাসে বসন্তবাতাসের

ন্যায় ঠিক যেন তরঙ্গ উত্থিত অনুরণন রূপে মধুর সুরে ব্যক্ত হয়। বিপদের এই ঘনঘোর দুর্যোগে একদিকে যেমন পরিত্রাণের আশা, অন্যদিকে স্বামীর প্রতি অসীম মমত্বে কেশবকে স্মরণ করে শান্তিদেবী জীবানন্দকে উৎসর্গ করে এমন গীত গেয়ে ওঠেন। হরিচরণে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ও জীবানন্দকে প্রাপ্তি অপ্রাপ্তির দোলাচলতায় তিনি বিহ্বলচিত্তে আন্তরিক প্রশান্তির জন্য এমন সংগীত গেয়ে উঠেছেন। এই শান্তির উদ্যোগেই পরবর্তী সময়ে কল্যাণী ও মহেন্দ্রর সাক্ষাৎ হয় ও ইংরেজদের স্বৈরাচারী রাজনীতির পটভূমিতে শান্তিদেবী বৈষ্ণবীয় ছদ্মবেশ ধারণ করে নিজেকে বৈষ্ণবীয় ভাবাশ্রিত চরিত্র রূপে উপন্যাসে ব্যক্ত করেন। শান্তির এই ছদ্মবেশ সম্পর্কে ঔপন্যাসিক জানিয়েছেন—

''চিকন রকম রসকলির উপর খয়েরের টিপ কাটিয়া তৎকালপ্রচলিত ফুরফুরে কোঁকড়া কোঁকড়া কতকগুলি ঝাপটার গোছায় চাঁদমুখখানি ঢাকিয়া, শান্তি একটি সারঙ্গ হস্তে বৈষ্ণবীবেশে ইংরেজ-শিবিরে দর্শন দিল। ... কেহ টপ্পা, কেহ গজল, কেহ শ্যাম বিষয়, কেহ কৃষ্ণবিষয়, ফরমাস করিয়া শুনিল।''[৩৬]

এই বৈষ্ণবী রূপ কৃষ্ণ ভাবাপন্ন, রোমান্টিক পরাকাষ্ঠার বলয়ে শান্তির মত চরিত্র পরোক্ষে দেশসেবায় যে আত্মবলিদানের পথ বেছে নিয়েছে, তাতে কোন তত্ত্বগত ভাবনার প্রতিমূর্তি না থাকলেও উপন্যাসের ক্ষেত্রে বড়ই প্রাসঙ্গিক বা বড়ই তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে, বঙ্কিমচন্দ্রের সন্ন্যাসীরা ছিলেন শক্তির উপাসক। অন্যদিকে লুটেরা সন্ন্যাসীরা ছিলেন শৈব, তারাই পরবর্তীকালে গোঁসাই নামে পরিচিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র এভাবেই বৈষ্ণব ও শাক্ত ভাবনাকে দেশমাতৃকার স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রাক্-পটভূমিরূপে উল্লেখ করে কাহিনীতে বিভিন্ন চরিত্রের সমাবেশে ও কার্যকলাপে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। ইতিহাসকে সেখানে তিনি প্রায় ইচ্ছাকৃতভাবেই অনুসরণ করেননি। সন্ন্যাসী উত্থানকে কেন্দ্র করে একটি স্বদেশকেন্দ্রিক ভাবনায় বৃহত্তর জনজীবনের কাহিনীকেই বাস্তব পটভূমিকায় উন্মুক্ত করতে চেয়েছেন উক্ত উপন্যাসের মাধ্যমে। মধ্যযুগীয় সংস্কৃতির সঙ্গে দেশমাতৃকার সেবায় 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রের মাধ্যমে একটি তত্ত্বোপন্যাস রচনা করে উপন্যাসের শিল্প নৈপুণ্যকে পূর্ণতা দিয়েছেন। সকল বন্ধন মুক্ত করে ত্যাগের আদর্শে জীবন অতিবাহিত করার বাণীই বৈষ্ণব প্রভাবিত সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। হত্যা, সংঘর্ষের মধ্যে দেশমাতৃকাকে উদ্ধার করা সম্ভব নয়। পরাধীন মানুষ মুসলিম থেকে ইংরেজ শাসনে করায়ত্ত হয়েছে, পরাধীনতার মোড়ক পরিবর্তিত হয়েছে, কিন্তু পরাধীন ভারতবাসী পরাধীন রয়ে গেছে। পরিশেষে সত্যানন্দের মত সন্ন্যাসী হিমালয়ে গমন করলেন, এই গমনের পেছনেও বঙ্কিমচন্দ্র

একটি উদ্দেশ্যকে প্রতিপাদিত করতে চেয়েছেন— যে উদ্দেশ্য গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে ষষ্ঠ থেকে নবম শ্লোকে বিবৃত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র গ্রন্থের আখ্যাপত্রে তার উল্লেখ করে লিখেছেন; যার অর্থ কৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ দেওয়ার সময় বলেছিলেন—

''হে পার্থ, কিন্তু যাঁরা সমস্ত কর্ম আমাতে সমর্পণ করে আমিই পরমপুরুষের উপাস্য, এইভাবে আমাতে যুক্ত থেকে যোগের দ্বারা আমার উপাসনা ও ধ্যান করেন, আমাতে সমর্পিত চিত্ত সেই সমস্ত ভক্তকে জন্মমৃত্যু রূপ সংসার সাগর থেকে আমি তাদের উদ্ধার করি। অতএব তুমি আমাতেই, তুমি মনঃসংযোগ কর ....''[৩৭]

অর্থাৎ 'মামেকং স্মরণংব্রজ' এটাই হল 'গীতা'র সারমর্ম। এই তাৎপর্য অনুধাবনের জন্যই উপন্যাসে সত্যানন্দের মত চরিত্রকে এনে বৈষ্ণব তথা কৃষ্ণ মাহাত্ম্যের ভগবৎ সত্তা ও পরম স্বরূপের এক বিশেষ দিককে ঔপন্যাসিক বোধগম্য করাতে চেয়েছেন।

উপন্যাসটিতে মধ্যযুগীয় বর্বরতা থেকে মুক্তি ও নতুন শাসকের মধ্য দিয়ে নবজাগরণের বাণী শ্রুত হলেও জাতীয় গণজাগরণের উৎস রূপেই একে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। চরিত্রগত নীতি নির্ধারণে সামান্য ত্রুটি বিচ্যুতি থাকলেও আদর্শের নবায়ণ, নারী চরিত্রের প্রেমময় আর্তি, বিচ্ছেদ, পুনর্মিলন, জাগতিক সুখ ঐশ্বর্য ত্যাগের মহিমার গোবিন্দ শ্রীহরিকে ত্রাণকর্তা প্রতিরূপে তাঁর পূর্ণশক্তির উপর আস্থায়, শ্রীরাধার ন্যায় বিরহ যন্ত্রণার সাদৃশ্যে, প্রেমতাত্ত্বিক আখ্যানে বা বৈষ্ণব ভাবাশ্রিত চরিত্রে, মানবিক জীবন আর্তি স্পন্দনে 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে সংযোজন করেছে নবযুগের বার্তা।

দেবীচৌধুরাণী (১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ) :

উপন্যাসটি প্রাচীন বাংলার বাংলা সামাজিক প্রেক্ষিতে একটি গার্হস্থ্য জীবনের কাহিনী সমৃদ্ধ তাত্ত্বিক বঙ্কিমচন্দ্রের এক মননশীল সৃষ্টি হিসেবে বাংলা সাহিত্যে স্বীকৃতি পেয়েছে। শ্রদ্ধেয় যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে উপন্যাসটি উৎসর্গ করেন বঙ্কিমচন্দ্র। মূলত লেখকের 'অনুশীলনতত্ত্ব'-এর আধারে এটি রচিত ও পরিবেশিত। উল্লেখযোগ্য চরিত্রের মধ্যে উঠে এসেছে ভবানীপাঠক, প্রফুল্ল, ব্রজেশ্বর। প্রফুল্লের মত একটি সাধারণ মেয়ের জীবনে আকস্মিক পটপরিবর্তন, যাকে শ্বশুরালয়ের প্রবল অত্যাচারের কারণে সংসার ত্যাগ করতে হয়, ভবানী পাঠকের মত পরাক্রমী ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে ধীরে ধীরে নারীত্বের পূর্ণবিকাশ, দেশমাতৃকার সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করে 'দেবীচৌধুরাণী'র মত প্রবল প্রতাপশালী দস্যুরানী হিসেবে উপস্থাপিত করার কাহিনী উপন্যাসের গতিপথকে বহুখাতে পরিচালিত করেছে। উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র 'গীতা'-র তত্ত্বমূলক দিককে প্রাধান্য

দিলেও নারী জীবনের উদ্দেশ্য, মর্যাদা, আত্মসম্মান মূলক বিষয়গুলি অনেকাংশে গুরুত্ব পেয়েছে। উপন্যাস রচনায় এক অনবদ্য কৃতিত্ব দেখিয়ে নীতি, আদর্শ, ধর্ম, সদাচার সম্পর্কে নিষ্ঠাবান হিন্দুদের এক প্রগাঢ় ভাবমূর্তিতে উপন্যাসটি আন্দোলিত হয়েছে।

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ২০ মে (১২৯৩ বঙ্গাব্দ) উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। সামাজিক অত্যাচার, অবিচার ও বিদ্রোহের প্রজ্বলিত বহ্নিমান শিখায় একটি নিগূঢ় গভীর সহানুভূতিপূর্ণ প্রেমের অভিষেক ঘটে উপন্যাসের মূলকাহিনীতে। উপন্যাসে প্রথম থেকেই নায়িকা প্রফুল্লের বিবাহ বিচ্ছিন্ন জীবনের চিত্র উঠে আসে। তার বিবাহ হয় বরেন্দ্রভূমের ভূতনাথ গ্রামের জমিদার হরবল্লভের পুত্র ব্রজেশ্বরের সঙ্গে। বিবাহ রাতেই ষড়যন্ত্রের স্বীকার হয়ে মাতুল কলঙ্কের অপবাদ নিয়ে প্রফুল্লকে বিবাহের পরদিনই শ্বশুরকুল ত্যাগ করতে হয়। বহুবছর পর সে শ্বশুরালয়ে গেলেও স্বামী সুখ থেকে সে বঞ্চিত হয়। ঘটনাক্রমে তাকে বহু বিপদের মধ্য দিয়ে অরণ্যপথে একাকী চলতে চলতে একটি বৃহৎ ভগ্নপ্রায় অট্টালিকায় শীর্ণ, শুষ্ক, দেহ বৈষ্ণবের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, বৈষ্ণবের প্রকৃত নাম কৃষ্ণগোবিন্দ দাস। কায়স্থের সন্তান হয়ে অনেক বয়সে সুন্দরী বৈষ্ণবীর হাতে রসকলি, খঞ্জনিতে চিত্ত বিকৃত করে বৈষ্ণবীর সঙ্গে বৃন্দাবনে গমন করে সেখানকার বৈষ্ণবদের সংস্পর্শে এসে জয়দেবের গীতি, 'শ্রীমদ্ভাবত গীতা'-র তাৎপর্য অনুধাবন ও জীবনের পুণ্যসঞ্চয়ে অধিক মনোনিবেশ করলেন। এভাবেই উপন্যাসের মধ্যে একটি বৈষ্ণব ভাবাশ্রিত চরিত্রের উপস্থিতি ও তার কুড়ি ঘড়া মোহর প্রাপ্তি ও পরিশেষে তা প্রফুল্লকে প্রদানের মধ্য দিয়ে মৃত্যুবরণ, উপন্যাসের মূলপর্বের সূচনা হয়। বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণগোবিন্দ দাসের মত চরিত্রের অবতারণা করে এক সহৃদয় বৈষ্ণব চরিত্র ও তার চিত্ত ঔদার্য্যের মধ্য দিয়ে কাহিনীর গতিপথকেই পৃথক মাত্রা সঞ্চারিত করে ভিন্ন খাতে নিয়ে গেছেন।

উপন্যাসে আরো এক স্ত্রী চরিত্রের সাক্ষাৎ হয়েছে, যিনি উপন্যাসে অপ্রধান চরিত্র হয়েও একটি বৈষ্ণব আদর্শকে সংক্ষিপ্ত পরিসরে তুলে ধরেছেন। ভবানী পাঠক প্রফুল্লের রক্ষণার্থে রমণীদের পাঠালে তাদের মধ্যে একজন বয়স্কা মহিলা ছিলেন। তাকে অল্পবয়সে লাঞ্ছনার স্বীকার হতে হয়, রাজবাড়িতে তাকে কিছু অসৎ লোক বিক্রি করে দিলে, রাজমহিষীর আন্তরিক দাক্ষিণ্যে কিছু গহনা নিয়ে পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে আত্মরক্ষার কালে ভবানী পাঠকের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। ভবানী পাঠকই তাকে উদ্ধার করে জীবনযুদ্ধে অনুপ্রাণিত করে তাকে বেঁচে থাকার রসদ যোগায়। বয়স্কা রমণী তার রূপ, যৌবন, প্রাণ সবকিছু ভবানী পাঠকের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন। তিনিই তার প্রাণকৃষ্ণ হয়ে ওঠেন, বয়স্কার কাছে তিনি যেমন রক্ষাকর্তা, অভিভাবক, ঠিক তেমনি কৃষ্ণ রূপ প্রেমিক

পুরুষও বটে। নিজেকে তিনি রাধা সমগোত্রীয়া রূপে তুলনা করেছেন। আর এখানেই আমরা সংযুক্ত করতে পারি বৈষ্ণব 'প্রেমতত্ত্ব'-এর হ্লাদিনী শক্তিকে, যে আনন্দধারা শ্রীকৃষ্ণকে লীলায় আগ্রহী করত, তিনিও সেই লীলার সাক্ষী হতে চেয়েছেন, চেতন অবচেতন মনের অন্তরালে, প্রফুল্লের মনেও ব্রজেশ্বরের প্রতি সেই প্রেমবহ্নির ফল্গুধারাকে বয়স্কা রমণীটি জাগ্রত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। উপন্যাসের একটি উক্তির মধ্য দিয়ে বৈষ্ণবীয় 'প্রেমতত্ত্ব'-কেই প্রত্যক্ষে কখনো বা পরোক্ষে ইঙ্গিতায়িত করেছেন।

''শ্রীকৃষ্ণে সকল মেয়ের মন উঠিতে পারে; কেন না তাঁর রূপ অনন্ত, যৌবন অনন্ত, ঐশ্বর্য্য অনন্ত, গুণ অনন্ত।''[৩৮]

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ হলেন পরমেশ্বর, সকল অবতার বা সুখ, অনন্তের আধার। তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত ঐশ্বর্য মাধুর্য, অসীম ব্রহ্মাণ্ডের শক্তির প্রতিরূপ। তাঁর প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গে সৎ, চিৎ ও আনন্দ রসধারা প্রবাহিত, তাই তাকে উপাসনার মধ্য দিয়ে তাঁর আরাধ্য প্রেয়সী বিশেষত সর্বকালের শিরোমণি শ্রীরাধা সহ সকলেই তার সান্নিধ্য পেতে চান, তাঁর মাধুর্য লাভই ঈশ্বরের নিকটবর্তী হওয়ার তপস্যাই ভক্তের কাছে একমাত্র উপজীব্য হয়ে ওঠে। ঠিক সেই প্রতিচ্ছবিই বয়স্কা রমণী ভবানী পাঠকের ব্যক্তিত্বে দেখে অভিভূত হয়েছিলেন। আর তারই প্রত্যক্ষ মনোভাব সে প্রফুল্লের মনে তার স্বামীর প্রতি সে জাগ্রত করতে চেয়েছিলেন উক্ত উক্তির মধ্য দিয়ে। তাই উপন্যাসে এক রোমান্টিক কথোপকথন মুহূর্তে ঔপন্যাসিক স্পষ্ট জানিয়েছেন প্রেম পবিত্র হলেও, স্বামী ঈশ্বরের নিকটস্থ হওয়ার প্রথম সোপান। তাইতো অনন্ত জগদীশ্বর হিন্দুর বক্ষপিঞ্জরে সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের অধিষ্ঠান। হিন্দু মেয়ের কাছে পতিই তার দেবতা, শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপেই নারীরা তাকে অধিক কামনা করে। বৈষ্ণবীয় 'কৃষ্ণতত্ত্ব' ও 'প্রেমতত্ত্ব'-এর এক গভীর দিক এই ক্ষুদ্র অংশ থেকে উদ্ঘাটিত হয়েছে, একথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

এরপর প্রফুল্ল ভবানীপাঠকের কাছে পাঁচ বছরের অধ্যয়ন কাল সমাপ্ত করেন। তার এই শিক্ষায় ইন্দ্রিয় সংযম, নিরহঙ্কার ধর্মাচরণের কথাই অধিক বলা হয়েছে। ভবানীপাঠক প্রফুল্লকে পূর্ণ শিক্ষা দানের পর স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন সর্বকর্মফল ঈশ্বররূপী শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করতে হবে। সকল আসক্তি থেকে নিজেকে মুক্ত করে ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণই জীবের একমাত্র কাম্য, এই শিক্ষাই প্রফুল্লের ভবিষ্যৎ জীবন নির্মাণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। সর্বসুখ কৃষ্ণে অর্পণের মধ্য দিয়ে উপন্যাসে আমরা বৈষ্ণবতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটের 'সাধ্য-সাধনতত্ত্ব'-এর এক গুরুত্বপূর্ণ দিকের কথা ইঙ্গিতায়িত হতে দেখি। 'চৈতন্যচরিতামৃত'-এর মুক্তির পথরূপে রামানন্দ মহাপ্রভুকে

জানিয়েছেন— 'কৃষ্ণে কর্মার্পণ সাধ্যসার' অর্থাৎ জীবের মুক্তি কামনায় কৃষ্ণের উপাসনায় নিজ কর্মকে অর্পণের মধ্য দিয়েই আমরা সাধ্যবস্তু লাভের পরবর্তী নির্বাণ স্তরে উপনীত হতে পারি। যদিও বৈষ্ণবতত্ত্বে 'কৃষ্ণে কর্মার্পণ'-কে 'এহোবাহ্য' বলা হয়েছে তবুও একে সাধনমার্গে সাধ্যবস্তু লাভের এক অন্যতম সোপান বলা যায়। কৃষ্ণ যেমন জগৎ পরিত্রাণে দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন করেছিলেন। ঠিক তেমনি ভবানী পাঠকের চরিত্রটিও সমগ্র উপন্যাস তথা সমকালীন যুগের এক রক্ষাকর্তা রূপেই উদ্ভাসিত হয়েছে একথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

'দেবীচৌধুরাণী' শিল্পের দিক থেকে অভাবনীয় কিছু না হলেও সহজ সরল ও সুখপাঠ্য একটি কাহিনী। হরবল্লভের মত শ্বশুরের নীচপ্রবৃত্তি, স্বামী ব্রজেশ্বরের চরিত্রে প্রফুল্লের স্নিগ্ধ আকর্ষণ সহ একটি সরলরৈখিক গতিপথে কিছু ত্রুটিবিচ্যুতির পরও মানবিক আবেদনকেই স্বীকৃতি দিয়ে শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে কাহিনী একটি পরিপূর্ণ পরিণতির দিকে গেছে ঠিক এই মহৎবাণী উচ্চারণের মধ্য দিয়েই এগিয়ে গেছেন—

''পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।।''[৩৯]

তাই পরিশেষে একথাই বলা যায় যে, বৈষ্ণবীয় তত্ত্ব-দর্শনের বিচারে 'শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব', 'প্রেমতত্ত্ব', 'সাধ্য-সাধন তত্ত্ব'-এর প্রচ্ছন্ন প্রবাহে উপন্যাসের কাহিনী অনেকাংশেই সম্পৃক্ত হয়েছে। এ কথা অনস্বীকার্য।

সীতারাম (১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দ) :

'সীতারাম' প্রকৃত পক্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বশেষ উপন্যাস। 'প্রচার' পত্রিকায় শ্রাবণ, ১২৯১ বঙ্গাব্দ থেকে মাঘ, ১২৯৩ বঙ্গাব্দ-এর মধ্যে প্রকাশিত হয়। মাঝে কয়েক মাসের বিরতি ছিল। উপন্যাসটি গ্রন্থরূপে মুদ্রিত হয় ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে। উপন্যাসটি বঙ্কিমচন্দ্র ঊনবিংশ শতাব্দীর বহুভাষাবিদ, অধ্যাপক, কবি, লেখক ও বন্ধু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করেন। মোঘল আমলের অন্তিম দিকের সময়কার প্রেক্ষাপটে উপন্যাসটি রচিত হয়। উপন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রগুলি হল সীতারাম, শ্রী, রমা, গঙ্গারাম। উপন্যাসের লোকশিক্ষাকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে ধর্মতত্ত্ব, দর্শন এতটা প্রভাব বিস্তার করে, তাতে এর শিল্পসত্তা অনেকাংশে ক্ষুণ্ণ হয়। মূলত 'গীতা'-র তত্ত্বকে তিনি এই উপন্যাস রচনায় গুরুত্ব দিয়েছেন। একদিকে রূপমুগ্ধতার ভোগলোলুপতা ও অন্যদিকে এক দার্শনিক প্রবৃত্তির ট্র্যাজিক দিক আলোচিত হওয়ার পাশাপাশি এক দার্শনিক তত্ত্ব, হিন্দুধর্মের পুনরুদ্ধার ও শ্রীকৃষ্ণের সেবায় আত্মনিয়োগ, মুক্তির পথ অনুসন্ধানের কাহিনী উপন্যাসে এক

জটিল আলেখ্য নির্মাণ করে ভ্রান্ত ঘূর্ণাবর্তে বিলীন হয়ে গেছে।

উপন্যাসের কাহিনী ধারার মধ্যে প্রথমেই সীতারামের প্রথমা পত্নী শ্রীর কথা ব্যক্ত করা হয়েছে। অসামান্য রূপসী হলেও তিনি স্বামীর ঘর করতে পারেননি। স্বামীর মঙ্গল কামনায় শ্রী স্বামী সান্নিধ্য ত্যাগ করে তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে পথে বেরিয়ে পড়েন এবং জয়ন্তী নামে এক বৈরাগিনী সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে তার পরিচয় হয় এবং সেখানেই জয়ন্তীর গুরুদেব তাকে দেখে জানান তিনি তার রাজরানী হবেন, কিন্তু তিনি রাজ-ঐশ্বর্য ভোগ করতে অসমর্থ হবেন এবং প্রিয় প্রাণহন্তী হবেন। এরপরেই শ্রী সন্ন্যাসিনী হয়ে বৈষ্ণবীয় নিষ্কামধর্ম ও আত্মসাধনার পথে অগ্রসর হন কিন্তু স্বামীর স্মৃতি তাকে প্রায়ই বিচলিত করত। শ্রীর এই দোলাচল জীবনের, নারীর বিরহ তাপিত অন্তর্যন্ত্রণায় জয়ন্তীকে ঠিক যেন 'মৃণালিনী' উপন্যাসে গিরিজায়ার ন্যায় পরম প্রিয় সখীরূপে উদ্ভাসিত করেছেন। ঔপন্যাসিক শ্রী ও জয়ন্তীর সখ্যতাকে শ্রীরাধিকা ও চন্দ্রাবলীর সঙ্গে সমগোত্রীয় রূপে বর্ণনা করেছেন এভাবে—

''ইহারা বোধহয় রুক্মিনী সত্যভামা সশরীরে স্বামী দর্শনে যাইতেছেন। ...অপরে মনে করিল যে, রুক্মিণী সত্যভামা শ্রীক্ষেত্রেই আছেন, তাঁহাদিগের গমন সম্ভব নহে; অতএব নিশ্চয়ই ইহাঁরা শ্রীরাধিকা এবং চন্দ্রাবলী, গোপকন্যা বলিয়া পদব্রজে যাইতেছেন। ... এদিকে শ্রীরাধিকা চন্দ্রাবলী আপন মনে কথোপকথন করিতে করিতে যাইতেছেন। ... সন্ন্যাসিনী বিরাগিনী প্রব্রজিতা, অনেক দিন হইতে তাহার সুহৃদ কেহ নাই; আজ একজন সমবয়স্কা প্রব্রজিতাকে পাইয়া তাহার চিত্ত একটু প্রফুল্ল হইয়াছিল। এখনও তার জীবনস্রোতঃ কিছুই শুকায় নাই, বরং শ্রীর শুকাইয়াছিল; কেননা শ্রী দুঃখ কি তাহা জানিয়াছিল, সন্ন্যাসী বৈরাগীর দুঃখ নাই।''[৪০]

অর্থাৎ সীতারামের প্রথমা স্ত্রী শ্রী ও জয়ন্তীকে শ্রীরাধা ও চন্দ্রাবলীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো রূপ গোস্বামী বিরচিত 'উজ্জ্বল নীলমণি' গ্রন্থটিতে কৃষ্ণসখী চন্দ্রাবলীর নমোল্লেখ পাওয়া যায়।

কাব্যে শ্রীকৃষ্ণের শৃঙ্গার চর্চার বিভিন্ন পর্যায়গত দিক আলোচনা করা হয়েছে। রূপ গোস্বামী স্নেহ, প্রেম, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাব এই সাতটি রতি নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং কৃষ্ণ প্রেমে মহীয়ান রসতাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় তার অন্যতম দুই সখী শ্রীরাধা ও চন্দ্রাবলীর যে উৎসর্গীকৃত ভূমিকা তা অভূতপূর্ব ভাবে উত্থাপিত হয়েছে। সেই একই প্রসঙ্গে প্রণয়ী সান্নিধ্যের আবহ থেকেই শ্রী ও জয়ন্তীর মতো আধুনিক উপন্যাসের নারীকে বৈষ্ণব শাস্ত্রের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে। তাত্ত্বিকেরা তাই গোপী প্রেমের বর্ণনায় স্ব-সুখবাসনা বহির্ভূত আত্মসমর্পিতা স্বতঃসিদ্ধ

প্রেমের আস্বাদন হেতুই শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যের অনির্বচণীয় আনন্দ আস্বাদনের কথা বলতে গিয়ে প্রথমে শ্রীরাধা ও চন্দ্রাবলীর মত নারীদের মনস্তত্ত্বকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তাই জয়ন্তীর চন্দ্রাবলী হয়েই শ্রীরাধা রূপী শ্রীর প্রেমকে প্রসারিত করতেই উপন্যাসে আগমন হয়েছে। তিনি সীতারামের জন্য শ্রীর মনে প্রেমাকাঙ্ক্ষা জাগ্রত রাখতে প্রয়াসী হয়েছেন, এ প্রসঙ্গে বড়ই প্রাসঙ্গিক যে, কৃষ্ণের ভজন, সর্বত্যাগ করে শ্রীরাধা যে প্রেমরস নির্যাস সেবনে আপ্লুত ছিলেন, ঠিক সেই রূপ অনুভবই সীতারামের প্রতি শ্রীর হৃদয়ে সুপ্ত ছিল, জয়ন্তীই 'সখীতত্ত্ব'-এর আলেখ্যে উজ্জীবিত করতে সহায়তা করেছে।

তাই পরিশেষে একথাই বলা যায় যে, 'সীতারাম' ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে নির্মিত হলেও ঔপন্যাসিক মূলত নরনারীর বহুকৌণিক সম্পর্ককে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা ও চরিত্র অসংযমের ব্যর্থতায় যে ভয়ংকর পরিণাম নেমে আসতে পারে, সেই বিপর্যয়ের চিত্রই তিনি সেখানে অঙ্কন করেছেন। প্রেমের প্রতিচ্ছবি কোথাও উন্মত্ত কামানলে পরিণত হয়েছে ঠিকই তবে জীবনের শেষপ্রান্তে এসে ঐতিহাসিক ক্ষেত্র থেকে বহুদূরে একটি কাল্পনিক চরিত্রের মধ্যেই লেখক নিজস্ব জীবন দর্শন ও কল্পনা বাস্তবকে একসঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। হিন্দুবীর সীতারামের রাজ্য প্রতিষ্ঠা ও মুসলিম শাসকের অত্যাচারের প্রতিবাদে হিন্দু আদর্শের উত্থান এই উপন্যাসের আলোচ্য বিষয় হলেও শ্রীর মত চরিত্রে প্রেম মনোবাঞ্ছা, সতীত্বের মর্যাদা লাভের পরিমণ্ডলে বৈষ্ণবীয় ভাবাদর্শকে এক সূক্ষ্ম সুতোর বন্ধনে গ্রথিত করে ঔপন্যাসিক যে কৃতিত্বের পরিচয় করিয়েছেন, তাতে পাঠকের হৃদয়ার্তিপূর্ণ গাঁথা রূপে উপন্যাসের এক ভিন্ন মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে একথা পরিশেষে বলা যায়, 'সীতারাম' উপন্যাসের মধ্যে বৈষ্ণবীয় পটচিত্র স্বল্প পরিসরে উঠে এলেও, বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যান্য উপন্যাসগুলির মধ্যে 'যুগলাঙ্গুরীয়' (১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দ), 'রজনী', (১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দ), 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দ), 'রাধারাণী' (১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দ) উপন্যাসগুলিতে বৈষ্ণব অনুষঙ্গের প্রভাব লক্ষ করা যায়নি।

বঙ্কিমচন্দ্রের নির্বাচিত উপন্যাসে বৈষ্ণবীয় তত্ত্ব-দর্শনগত দিককে বিচার করে বেশ কয়েকটি অভিমুখকে পর্যালোচনা করা হয়েছে। বাংলা উপন্যাসের সূচনালগ্নে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র পূর্ব যে সময়, সেখানে জীবনের এক বহুব্যাপ্তময় আলোকবৃত্তে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নাম সবার ঊর্দ্ধে অবস্থিত একথা নিঃসন্দেহে বলার দাবি রাখে। তিনি নবজাগরণের এক গুরুত্বপূর্ণ সময় বৃত্তে দাঁড়িয়ে ইতিহাস ও কল্পনার সঙ্গে নরনারীর রোমান্টিক বহুকৌণিক সম্পর্ক, বিষাদ, বিরহ, বেদনা, রসবোধ, মননশীলতা, সহানুভূতি, সহমর্মিতা, সমবেদনার মত বিষয়গুলিকে একসূত্রে গ্রথিত করে

প্রতিভার এক উচ্চাঙ্গ সৃজনশীলতাকে প্রস্ফুটিত করতে পেরেছিলেন। নীতি ও শিল্পের বহু দ্বন্দ্বমূলক প্রেক্ষাপটে তিনি নীতিকে গুরুত্ব দিলেও শিল্পকে অবহেলা করতে পারেননি। ১৮৮২ সালের পূর্ব থেকেই তিনি হিন্দু ধর্ম, দর্শন, মহাকাব্য, পুরাণ, হিন্দুশাস্ত্র, স্মৃতিশাস্ত্র ও দর্শনের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হয়েছিলেন। বৈষ্ণবীয় ভাবাদর্শের প্রতি তাঁর মতাদর্শ, উক্তি শাস্ত্রচর্চার মধ্য দিয়েই গড়ে উঠেছিল। এ প্রসঙ্গে উপন্যাসের পাশাপাশি তাঁর রচিত প্রবন্ধের মধ্যে বিশেষত 'কৃষ্ণচরিত্র' (১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দ, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ, ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দ), ধর্মতত্ত্ব (১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দ) গ্রন্থে তাঁর সেই মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। বেন্থাম, মিল, কোঁৎ-এর মতো লেখক, দার্শনিকগণের চিন্তাধারা ধর্মমতের ক্ষেত্রে তাকে প্রভাবিত করলেও হিন্দু ধর্ম ও মতাদর্শকেই সকল সৃষ্টির উৎসে গুরুত্ব দিয়েছেন। 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসে জয়দেবের 'গীতগোবিন্দম্'-এর উত্থাপন, 'কপালকুণ্ডলা'য় বিদ্যাপতির পদের সরাসরি ব্যবহার, প্রেম মাহাত্ম্য বিচার, 'মৃণালিনী'-তে গিরিজায়ার মতো বৈষ্ণবপ্রভাবিত চরিত্রে 'সখীতত্ত্ব' এবং সেই সঙ্গে কৃষ্ণ বিরহিনী শ্রীরাধার প্রসঙ্গে নায়িকার প্রেমাকুলতাকে বোধগম্য করানোর জন্য উত্তমরূপে পরিস্ফুট করেছেন। এমনকি, মৃণালিনীর মথুরাভিসার প্রসঙ্গের মধ্য দিয়ে গোবিন্দদাসের অভিসারিকা রাধার কথা বারম্বার স্মরণ হয়েছে। 'বিষবৃক্ষ'-এ দেবেন্দ্রর মতো চরিত্রের হরিদাসী বৈষ্ণবীর ছদ্মবেশের মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক কুন্দনন্দিনীর পূর্বরাগে, অনুরাগের মানচিত্র অঙ্কনে সমর্থ হয়েছেন, 'ইন্দিরা' উপন্যাসে তার সখী কামিনীর উক্তি-প্রত্যুক্তিতে, 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে শৈবলিনীর কণ্ঠে প্রিয় মিলনের আকাঙ্ক্ষায় গীত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মনোমোহিনী সংগীতে, 'রাজসিংহ'-এর একটি ছোট অংশে চঞ্চলকুমারীকে নিয়ে যাবার সময় মানিকলালের গোপকুমারী ও মোহনকুমারী রূপে গীতের অবতারণায় বৈষ্ণবীয় প্রেমতত্ত্ব প্রস্ফুটিত হয়েছে। 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের সত্যানন্দ চরিত্রে, শান্তির সংলাপের বহুক্ষেত্রে বৈষ্ণবীয় পদমূর্চ্ছনার আকুল ধ্বনির অনুরণন শোনা যায়। 'দেবীচৌধুরাণী'-র এক অপ্রধান বয়স্কার উক্তি প্রফুল্লের মত নারীর হৃদয়ে ব্রজেশ্বরের প্রতি বিহ্বল করে, 'সাধ্য-সাধন তত্ত্ব'-এর অবতারণায় কৃষ্ণে সর্বকর্ম অর্পণ করার কথা সেখানে বাণীরূপ পেয়েছে। সর্বশেষ 'সীতারাম' উপন্যাসে শ্রী ও তার সখী বৈষ্ণবী জয়ন্তীর মধ্যে শ্রীরাধা ও চন্দ্রাবলীর তুলনা স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রই প্রত্যক্ষ উক্তির মধ্য দিয়ে উপস্থাপিত করে গেছেন। তাইতো আধুনিক যুগের প্রথম সার্থক ঔপন্যাসিক রূপে একদিকে মানবজীবন, ইতিহাস, সমাজকে চিহ্নিত করে মানবমনের অতলসীমানাকে বৈষ্ণবীয় তত্ত্ব ও দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠা দিয়ে তাতে প্রোথিত করেছেন অভিনব প্রেমসত্তা। এখানেই তাঁর সাহিত্য যেমন সমৃদ্ধ হয়েছে, তেমনি তাঁর সর্বব্যাপক প্রতিভার স্বীকৃতি প্রাপ্ত হয়েছে। 'কৃষ্ণতত্ত্ব', 'রাধাতত্ত্ব', 'প্রেমতত্ত্ব', 'সখিতত্ত্ব',

‘স্বকীয়া-পরকীয়াতত্ত্ব’, ‘পরম-স্বরূপতত্ত্ব’, ‘সাধ্য-সাধনতত্ত্ব’-এর সমাহারে রসভাষ্য হয়ে বঙ্কিমচন্দ্রকে বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ঔপন্যাসিকের পদমর্যাদায় অভিষিক্ত করা হয়েছে।

তথ্যসূত্র:

১. ‘বঙ্কিম রচনাবলী’, প্রথম খণ্ড, শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, ‘সমগ্র উপন্যাস’, সাহিত্য সংসদ, ৩২এ আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ-আশ্বিন ১৩৬০, দ্বিতীয় প্রকাশ-মাঘ ১৩৬৩, মুদ্রণ সংখ্যা ৫১০০, পৃ. ৬৪

২. তদেব, পৃ. ৬৪-৬৫

৩. তদেব, পৃ. ৬৫

৪. তদেব, পৃ. ৭৫

৫. তদেব, পৃ.১৬৯

৬. তদেব, পৃ.১৭৪

৭. তদেব, পৃ.১৯৪

৮. তদেব, পৃ.১৯৪-১৯৫

৯. তদেব, পৃ.১৯৫

১০. তদেব, পৃ.১৯৬

১১. তদেব, পৃ.১৯৬

১২. তদেব, পৃ.১৯৮

১৩. তদেব, পৃ.২০৪

১৪. তদেব, পৃ. ২০৯

১৫. তদেব, পৃ.২২৬

১৬. তদেব, পৃ.২২৭

১৭. তদেব, পৃ.২৩৪

১৮. ‘গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের ভূমিকা’, ড. সুখেন্দু সুন্দর গঙ্গোপাধ্যায়, সোনার তরী, ৪এ নর্থ নওদাপাড়া রোড, কলিকাতা-৬৭, প্রথম চলিত ভাষায় পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিতসংস্করণ, বইমেলা জানুয়ারী, ১৯৯৭, পৃ.৫৪

১৯. ‘বঙ্কিম রচনাবলী’, প্রথম খণ্ড, শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, ‘সমগ্র উপন্যাস’, সাহিত্য সংসদ, ৩২এ

আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ-আশ্বিন ১৩৬০, দ্বিতীয় প্রকাশ-মাঘ ১৩৬৩, মুদ্রণ সংখ্যা ৫১০০, পৃ. ২৬১

২০. তদেব, পৃ.২৯৯

২১. তদেব, পৃ.৩২২

২২. তদেব, পৃ.২৭২

২৩. তদেব, পৃ.২৭৩-২৭৪

২৪. তদেব, পৃ.৩৪২

২৫. তদেব, পৃ.২৭৪

২৬. তদেব, পৃ.৩৪৯

২৭. তদেব, পৃ.৩৮২

২৮. তদেব, পৃ.৪০৪

২৯. তদেব, পৃ.৪৬৬

৩০. তদেব, পৃ.৪৬৭

৩১. তদেব, পৃ. ৬৪৭

৩২. তদেব, পৃ.৭১৯

৩৩. তদেব, পৃ.৭৩৫

৩৪. তদেব, পৃ.৭৬০

৩৫. তদেব, পৃ.৭৬৭

৩৬. তদেব, পৃ.৭৮০-৭৮১

৩৭. 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত', অষ্টম খণ্ড, অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বঙ্কিমপর্ব', মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রা:লি:, ১০ বঙ্কিমচ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, প্রথম সংস্করণ: ১৯৯৮, তৃতীয় সংস্করণ: ২০০৭, পুনর্মুদ্রণ: ২০১০-১১, পৃ. ৫৬৭

৩৮. 'বঙ্কিম রচনাবলী', প্রথম খণ্ড, শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, 'সমগ্র উপন্যাস', সাহিত্য সংসদ, ৩২এ আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ-আশ্বিন ১৩৬০, দ্বিতীয় প্রকাশ-মাঘ ১৩৬৩, মুদ্রণ সংখ্যা ৫১০০, পৃ. ৮১৩

৩৯. তদেব, পৃ.৮৭২

৪০. তদেব, পৃ. ৮৯২